পড়াশোনার ক্রোড়পত্র

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ৩ জানুয়ারি ২০১৭

উত্তরণ

৮ পাতার এই রঙিন ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

ক্যালেন্ডার আবিষ্কার

দু'দিন আগেই তোমরা পালন করেছ নিউ ইয়ার সেলিব্রেশন। ২০১৬ পেরিয়ে আমরা চলে এলাম ২০১৭ সালে। পৃথিবীব্যাপী যত উৎসব পালন করা হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে পুরনো উৎসব হল এই ইংরেজি বর্ষবরণ। এই উৎসবের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৪০০০ বছর আগে, খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে। সে সময় মেসোপটেমীয় সভ্যতায় প্রথম বর্ষবরণ উৎসব চালু হয়। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তাকে বলা হয় মেসোপটেমিয় সভ্যতা। বর্তমানের ইরাককে প্রাচীনকালে বলা হতো মেসোপটেমিয়া। এই মেসোপটেমিয়ান সভ্যতায় আবার চারটি আলাদা আলাদা ভাগ আছে– সুমেরীয় সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, আসিরীয় সভ্যতা এবং ক্যালডীয় সভ্যতা। এদের মধ্যে বর্ষবরণ পালন করা শুরু হয় ব্যাবিলনীয় সভ্যতায়। সে সময় বর্ষবরণ উৎসব বেশ জাঁকজমকে পালন করা হতো। তবে সেটা কিন্তু এখনকার মতো জানুয়ারির ১ তারিখে পালন করা হতো না। তখন নিউ ইয়ার পালন করা হতো বসন্তের প্রথম দিন। বসন্তকালে প্রকৃতির নতুন সাজে সেজে ওঠাকেই তাঁরা নতুন বছরের শুরু বলে চিহ্নিত করতেন। অবশ্য তখন তাঁরা চাঁদ দেখেই বছর গণনা করা হতো। উৎসবের শুরু হতো চাঁদ দেখেই। যেদিন বসন্তের প্রথম চাঁদ উঠত, সেদিন থেকেই শুরু হতো বর্ষবরণ উৎসব।

ব্যাবলনীয় সভ্যতার পর জাঁকজমক করে নববর্ষ পালন করা হয় শুরু করেন রোমানরা। রোমের উপাখ্যান-খ্যাত প্রথম সম্রাট রোমুলাসই ৩৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোমান ক্যালেন্ডার চালু করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই ক্যালেন্ডারও রোমানরা চাঁদ দেখেই বানিয়েছিলেন। আর সেই ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, তাঁদের নববর্ষ ছিল ১ মার্চ। প্রথমদিকে তাঁদের ক্যালেন্ডারে মাত্র ১০টি মাস ছিল। ছিল না জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি। পরে সম্রাট নুমা পনিলাস জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারিকে ক্যালেন্ডারে যোগ করেন। উল্লেখ্য, রোমানদের ওই ক্যালেন্ডারের তারিখও ছিল না। তাঁরা ধীরে ধীরে চাঁদের বেড়ে ওঠার ছবি দিয়ে মাসের বিভিন্ন সময়কে চিহ্নিত করতেন। পরে সম্রাট জুলিয়াস সিজার এই ক্যালেন্ডারের পরিবর্তন করেন। চাঁদের আকৃতির ঝামেলা শেষ করে তিনি বসিয়ে দেন তারিখ। ফলে বছরে মোট ৩৫৫ দিন হয়। যেহেতু চাঁদের হিসাবে প্রতি মাসে দিন হয় সাড়ে ২৯টি। তাই চাঁদের হিসাব করায় বছরে ১০ দিন কমে যায়। এতে চাষিরা সমস্যায় পড়ে যান। পরে অনেক চিন্তাভাবনা করে সম্রাট সিজার চাঁদের পরিবর্তে সূর্য দিয়ে হিসাব করে বছরকে ৩৬৫ দিনে এনে সমস্যার সমাধান করেন। রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার লিপইয়ার বছরেরও প্রচলন করেন। জুলিয়াস সিজার আলেকজান্দ্রিয়া থেকে গ্রিক জ্যোতির্বিদ মোসাজিনিসকে নিয়ে আসেন ক্যালেন্ডার সংস্কারের জন্য। মোসাজিনিস দেখেন পৃথিবী সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা। ৩৬৫ দিনে বছর হিসাব করা হলে এবং প্রতি চতুর্থ বছরে ৩৬৬ দিনে বছর হিসাব করলে হিসাবের কোনও গরমিল হয় না। তাই মোসাজিনিস অতিরিক্ত একদিন যুক্ত করে এই বছরটির নাম দেন 'লিপ ইয়ার'।

তবে সিজারের ক্যালেন্ডারেও ছিল বেশ কিছু সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানে মাত্র ৪০০ বছর আগে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে রোমের পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি জ্যোতি-র্বিজ্ঞানীদের পরামর্শ নিয়ে ক্যালেন্ডারটির সংস্কার করেন।

এরপর সাতের পাতায়

দুইয়ের পাতায়
ক্লাস সিক্স-এর টিউশন
বিজ্ঞান
ইতিহাস
তিনের পাতায়
ক্লাস সেভেন-এর টিউশন
বাংলা
ভূগোল
চারের পাতায়
ক্লাস এইট-এর টিউশন
ইংরেজি
বিজ্ঞান
পাঁচের পাতায়
ক্লাস নাইন-এর টিউশন
ইতিহাস
বাংলা
ছয়ের পাতায়
ক্লাস টেন-এর টিউশন
ভূগোল
ইংরেজি
সাতের পাতায়
কম্পিউটার
সাধারণ জ্ঞান
আটের পাতায়
এডু টিপস

'উত্তরণ'-এর মুখোমুখি | রোল নং ওয়ান

টেনশন করলে পড়া ভুলে যাব

পলাশ মণ্ডল দশম শ্রেণি,
মুড়াগাছা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়

মাধ্যমিক প্রায় চলেই এল। জীবনের একটা বড় ধাপ পেরনোর পালা। তার জন্য নিজেকে তৈরি করছে পলাশ। তার এখন একটাই লক্ষ্য ভালো করে পড়াশোনা করে মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করা। মাধ্যমিকের জন্য কীভাবে নিজেকে তৈরি করছে, দিনে কতক্ষণ পড়াশোনা করছে জানাল, 'উত্তরণ'-কে।

উত্তরণ: মাধ্যমিকের জন্য টেনশন হচ্ছে?

পলাশ: না। টেনশন করলে সব ভুলে যাব। শুধু মন দিয়ে পড়াগুলো তৈরি করছি।

উত্তরণ: দিনে কতক্ষণ পড়াশোনা করছ?

পলাশ: দশ-বারো ঘণ্টা। ভোরবেলা পাঁচটায় উঠে পড়তে বসি। ভোরবেলায় ভালো পড়া হয়। তারপর ন'টা-সাড়ে ন'টা পর্যন্ত পড়ি। পড়া হয়ে গেলে স্নান-খাওয়া সেরে আবার এগারোটা থেকে পড়তে বসি তখন একটা-দেড়টা পর্যন্ত পড়ি। তারপর কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে আবার পড়তে বসি। এক-দেড় ঘণ্টা পড়ি। বিকেলে খেলতে যাই। এসে একটু বিশ্রাম নিয়ে, খেয়ে পড়তে বসি। দশটা পর্যন্ত পড়ি।

উত্তরণ: একটানা পড়তে ভালো লাগে?

পলাশ: না। পড়তে পড়তে ভালো না লাগলে বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি। গান শুনি।

উত্তরণ: পড়াগুলো ভালো ভাবে তৈরি করার জন্য কীভাবে পড়ছ?

পলাশ: স্কুলের টেক্সট বইটা আগে ভালো করে পড়ছি। পড়া হয়ে গেলে সেটা না দেখে লিখছি।

উত্তরণ: পছন্দের সাবজেক্ট?

পলাশ: অঙ্ক।

উত্তরণ: দিনে কতক্ষণ অঙ্ক প্র্যাকটিস করো?

পলাশ: তিনঘণ্টা করে। দুপুরবেলা আর সন্ধেবেলা কিছুক্ষণ অঙ্ক করি।

উত্তরণ: স্কুলের বই ছাড়া আর কোনও বই ফলো করছ?

পলাশ: হ্যাঁ, টেস্টপেপার সলভ করছি। কোয়েশ্চেন ব্যাংক ফলো করছি।

উত্তরণ: মাধ্যমিকে কীরকম রেজাল্ট আশা করছ?

পলাশ: ভালো। ছ'শোর ওপর যাতে নম্বর থাকে সেই মতো তৈরি হচ্ছি।

উত্তরণ: বড় হয়ে তোমার কী স্বপ্ন?

পলাশ: আমার খুব ইচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। বাড়ির সকলে বলেন তার জন্য আগে ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে। তাই এখন মন দিয়ে পড়াশোনা করছি।

উত্তরণ: পলাশ, তুমি তোমার স্বপ্নপূরণের পথে এগিয়ে চলো। রইল শুভেচ্ছা ও শুভকামনা।

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা কর

ড. লীনা দত্ত প্রধান শিক্ষিকা
উলুবাড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়

আর কয়েকদিন পরেই শুরু হয়ে যাবে পরীক্ষার মরশুম। এর মধ্যে মাধ্যমিক হচ্ছে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। বলা যেতে পারে, মাধ্যমিক হল ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ তৈরির প্রথম ধাপ। তাই মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করা চাই। তবেই পরবর্তী সময়ে কী নিয়ে পড়াশোনা করবে তা ডিসাইড করতে পারে পড়ুয়ারা। সারা বছর ধরে ঠিকঠাক পড়াশোনা করলেও পরীক্ষার আগে যা পড়া হয় সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো। যতটুকু পড়বে মন দিয়ে পড়ো। পড়াশোনার পাশাপাশি জেনারেল নলেজও বাড়াতে হবে। বই, খবরের কাগজ নিয়মিত পড়ো। এতে দেশ-দুনিয়ার খবরও জানতে পারবে আর জেনারেল নলেজও বাড়বে। এই ক্ষেত্রে ইন্টারনেট থেকেও সাহায্য নিতে পারো। ইন্টারনেটে জ্ঞান আহরণ করার প্রচুর রসদ রয়েছে। যে কোনও আবিষ্কার, দেশের খবর, বইয়ের খবর সবই ইন্টারনেটে উপলব্ধ। অন্যদিকে, আজকাল প্রায় সব স্টুডেন্টই প্রাইভেট টিউশন নিয়ে থাকে। এতে ক্ষতির কিছু নেই, তবে শিক্ষক যা পড়াবেন, তা মনোযোগ দিয়ে শোনা ও বোঝা তোমাদের কর্তব্য। এবং শুধু শিক্ষকের উপর সব ছেড়ে বসে থাকলে হবে না। একবার না বুঝলে শিক্ষককে বার বার জিজ্ঞেস করো। সব শেষে বলব, বেশি রাত জেগে পড়বে না। শরীর ও মগজের সঠিক বিশ্রাম না হলে ক্লান্ত হয়ে যাবে। এতে পড়াশোনায় ক্ষতি হবে। তোমাদের পরীক্ষা ভালো হোক, তোমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ৩ জানুয়ারি ২০১৭

স্মরণীয় যাঁরা
(৩ জানুয়ারি - ৯ জানুয়ারি)

শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক এবং সাহিত্যিক
মদনমোহন তর্কালঙ্কার
(জন্ম: ৩ জানুয়ারি, ১৮১৭, মৃত্যু: ৯ মার্চ, ১৮৫৮)

'পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল' বা 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,' ইত্যাদির রচয়িতা মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন নদিয়ার বিল্ব গ্রামে। ১৮২৯ সালে সংস্কৃত কলেজে পড়তে গিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। কুসংস্কার, নানা সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে ও ইংরেজি এবং স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের জন্য ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন 'হিন্দু বিধবা বিবাহ' প্রথার অন্যতম উদ্যোক্তা। কর্মজীবনে হিন্দু কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ এবং সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে মুর্শিদাবাদ এবং কান্দিতে দাতব্য চিকিৎসালয়, মেয়েদের স্কুল, রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। ১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেবের মেয়েদের জন্য 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' স্থাপনে মদননোহন ছিলেন তাঁর প্রধান সহযোগী। বিনা বেতনে তিনি ওই স্কুলে পড়াতেন। কবি-প্রতিভার জন্য সংস্কৃত কলেজ থেকে তিনি 'কাব্যরত্নাকর' এবং পাণ্ডিত্যের জন্য 'তর্কালঙ্কার' উপাধি লাভ করেন।

'স্মরণীয় যাঁরা' লিখেছেন: **প্রতাপচন্দ্র সাহা**
(শিক্ষক, মুড়াগাছা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়)

ক্লাস সিক্স-এর টিউশন | বিজ্ঞান

বল ও শক্তির প্রাথমিক ধারণা

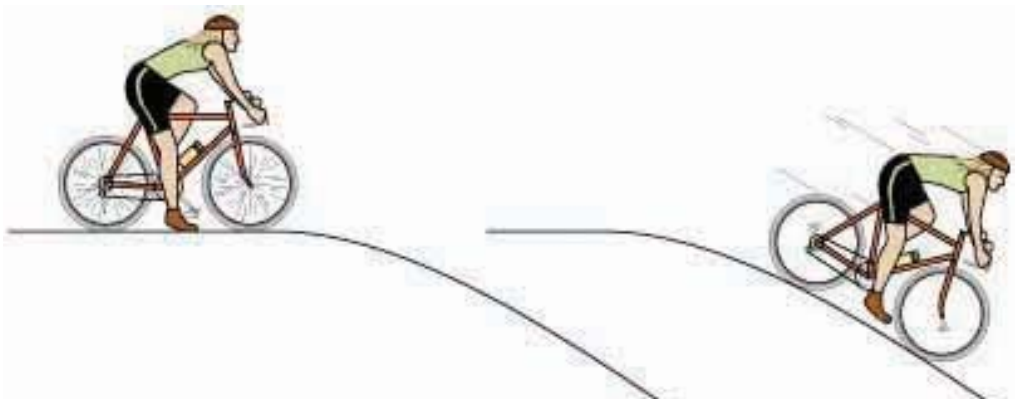

আজ আমরা স্থিতি, গতি ও শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করব।

যে-বস্তুগুলো সময়ের সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করে না তাকে স্থিরবস্তু বলে। আমাদের চারপাশে অনেক কিছু আছে যেমন গাছ, বাড়ি, দোকান এগুলি এক জায়গায় স্থির থাকে। আমরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করতে পারি, কিন্তু এগুলি পারে না। তাই এগুলো স্থিরবস্তু।

যে বস্তুগুলো সময়ের সাথে স্থান পরিবর্তন করে, সেই বস্তুগুলিকে গতিশীল বস্তু বলে। যেমন মানুষ, পাখি, জীবজন্তু, বাইক, সাইকেল প্রভৃতি। চলন্ত ট্রেনের বা বাসের জানালায় বসলে বাইরের দিকে তাকালে বাইরের বস্তুগুলিকে চলমান মনে হয়। এর থেকে বোঝা যায় কোনও বস্তু স্থির না গতিশীল এবং তা কিছুটা নির্ভর করে যে দেখছে তার অবস্থার উপর। কোনও স্থিরবস্তুকে গতিশীল করতে বা গতিশীল বস্তুর বেগ বাড়াতে বা কমাতে বা গতিশীল বস্তুটিকে স্থির অবস্থায় আনতে বা গতিশীল বস্তুটির দিক পরিবর্তন করতে, বাইরে থেকে বস্তুটির উপর ক্রিয়া করতে হয়।

বাইরে থেকে প্রযুক্ত যে কারণের ফলে স্থির বস্তু সচল হয় বা সমবেগে গতিশীল বস্তু থেমে যায় বা তার বেগ বাড়ে বা কমে বা দিক পরিবর্তন হয় সেই কারণকে বল বলে। S.I. পদ্ধতিতে বলের একক নিউটন এবং CGS পদ্ধতিতে বলের একক ডাইন।

বলের প্রভাব: বল কোনও বস্তুর আকৃতি বা আয়তন পরিবর্তন করতে পারে। কোনও স্প্রিংকে দু'দিক থেকে জোরে চেপে ধরলে সেটি যতটা সংকুচিত হয়, আলতো করে চাপলে ততটা সংকুচিত হয় না। তেমনি কোনও ফুটবলকে জোরে ধাক্কা দিলে যতটা যাবে, আলতো করে ধাক্কা দিলে সেই ফুটবল বেশি দূর যাবে না। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে বল যত বেশি, বলের প্রভাবে সংঘটিত ঘটনার মাত্রাও তত বেশি।

স্পর্শহীন বল: স্পর্শ না করেও কিছু জিনিসের ওপর বলপ্রয়োগ করা যায়, তার উদাহরণ হল চুম্বক। চুম্বক নির্দিষ্ট কিছু পদার্থের ওপর বলপ্রয়োগ করে, সেই পদার্থগুলিকে বলে চৌম্বক পদার্থ। যেমন-- লোহা, নিকেল, কোবাল্ট ইত্যাদি।

কোনও কোনও বস্তুকে উপর থেকে ছেড়ে দিলে, বস্তুটি নীচের দিকে পড়তে শুরু করে। এক্ষেত্রে বস্তুটির উপর পৃথিবী বল প্রয়োগ করে, যা স্পর্শ ছাড়াই ক্রিয়া করে। এই বলের নাম অভিকর্ষ বল বা ওজন। যেহেতু ওজন একটি বল তাই, S.I. পদ্ধতিতে ওজনের একক নিউটন এবং CGS পদ্ধতিতে ওজনের একক ডাইন।

শক্তি: কাজ করার সামর্থ্যই হল শক্তি। শক্তি দুইপ্রকার--

ক) গতিশক্তি: গতিশীল অবস্থায় বস্তুর মধ্যে কাজ করার যে সামর্থ্য বা শক্তি আসে, তাকে বলে গতিশক্তি। বায়ুর গতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে পালতোলা নৌকা চালানো হয়।

খ) স্থিতিশক্তি: বস্তুর আকৃতির পরিবর্তন ঘটালে বস্তুর মধ্যে কাজ করার সামর্থ্য বা শক্তির জোগান ঘটে। এই শক্তিকে স্থিতিশক্তি বলে।

স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তিকে একত্রে যান্ত্রিক শক্তি বলে।

শক্তির রূপান্তর: শক্তি প্রকৃতিতে নানান রূপে থাকতে পারে। শক্তি কখনও শেষ হয়ে যায় না। এক ধরনের শক্তি অন্য ধরনের শক্তিতে রূপান্তরিত হয় মাত্র। শক্তি নানা প্রকারের হয় যেমন-- ১) যান্ত্রিক শক্তি, ২) তাপ শক্তি, ৩) শব্দ শক্তি, ৪) আলোক শক্তি, ৫) তড়িৎ শক্তি, ৬) চৌম্বক শক্তি, ৭) রাসায়নিক শক্তি এবং ৮) পারমাণবিক শক্তি।

ইলেকট্রিক ইস্ত্রি চালালে তড়িৎ শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আবার পোড়া চুন ও জলের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয়, এক্ষেত্রে রাসায়নিক শক্তি তাপ শক্তিতে পরিণত হয়।

শক্তি শৃঙ্খল: উদ্ভিদ নিজের দেহে নিজেই নিজের খাদ্য উৎপাদন করতে পারে বলে উদ্ভিদকে উৎপাদক বলে। যে সমস্ত প্রাণীরা উদ্ভিদকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে ও মাত্র উদ্ভিদ থেকেই প্রয়োজনীয় শক্তি পায়, তারা প্রথম শ্রেণির খাদক। আবার যে প্রাণীরা প্রথম শ্রেণির খাদককে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে ও প্রয়োজনীয় শক্তি পায়, তারা দ্বিতীয় শ্রেণির খাদক। আর যারা উদ্ভিদ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির খাদককে খায় তাদের সর্বভুক বলে। শক্তি খাদ্যের মাধ্যমে উৎপাদক থেকে প্রথম শ্রেণির খাদকে (এক্ষেত্রে উদ্ভিদ খাদ্য), আবার প্রথম শ্রেণির খাদক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির খাদকে (এক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণির খাদক হল খাদ্য) সঞ্চারিত হয়ে শক্তিশৃঙ্খল গঠন করে। শক্তিশৃঙ্খলে এরকম পর্যায়ক্রমিক খাদ্য-খাদক সম্পর্কযুক্ত শৃঙ্খলকেই বলে খাদ্যশৃঙ্খল। খাদ্যশৃঙ্খলে যুক্ত এক জীব থেকে অন্য জীবে পর্যায়ক্রমে শক্তি প্রবাহিত হয়।

ক্লাস সিক্স-এর টিউশন | ইতিহাস

বৌদ্ধ ধর্ম

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন গৌতম বুদ্ধ। তিনি নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তুর শাক্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৬ অব্দে। প্রথম বয়সে তাঁর নাম ছিল সিদ্ধার্থ। তিনি ঊনত্রিশ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে চলে যান তপস্যা করতে। প্রায় ছয় বছর তপস্যার পরে তিনি বোধি বা জ্ঞান লাভ করেন, সেই থেকেই তাঁর নাম হয় গৌতম বুদ্ধ। তাই তাঁর প্রচারিত ধর্মকে বলা হয় বৌদ্ধ ধর্ম। তিনি গয়া থেকে সারনাথে যান, সেখানে গয়ার কাছাকাছি একটি পিপল গাছের নীচে বসে তপস্যা করেছিলেন, সেই থেকে ওই বৃক্ষকে বলা হয় বোধিবৃক্ষ।

সারনাথে পাঁচজন শিষ্যের মধ্যে তিনি তাঁর উপদেশ প্রচার করেন এঁরাই ছিলেন তাঁর প্রথম শিষ্য। পরবর্তীকালে তাঁরা এগুলি প্রচার করেন। একে 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' বলা হয়।

বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের কাছে দুঃখ ও তার থেকে মুক্তির উপায় আলোচনা করতেন। এই প্রসঙ্গে তিনি চারটি উপদেশ দেন যাদের এক-একটিকে 'আর্যসত্য' বলা হয় তাই চারটেকে মিলিতভাবে বলে 'চতুরার্যসত্য'। দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি আটটি পথ বা মার্গ নির্দেশ করেছেন এগুলিকে বলা হয় 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'।

এরপরে বুদ্ধ রাজগৃহে যান যেখানে মগধের রাজা বিম্বিসার তাঁর শিষ্য হন। সেখানে বছরে আট মাস তিনি ধর্মপ্রচার করতেন। তিনি কোশল রাজ্যে টানা ২১ বছর ধর্মপ্রচার করেন। প্রায় ৪৫ বছর এই বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের পর খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৬ অব্দে তিনি কুশিনগরে দেহত্যাগ করেন।

বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্মসংগীতগুলির খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কারণ এগুলো শুধু সংগীত নয়, এর মাধ্যমে তার বাণীর প্রচার যেমন হতো তেমনই উঠত নানা তর্কের বিষয়। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা। অর্থাৎ ধর্ম বিষয়ে কারওর কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে এখানে যুক্তি দিয়ে তা বিশ্লেষণও করা হতো। এরকম চারটি বৌদ্ধ সংগীতের সন্ধান পাওয়া যায় যদিও সেগুলি বুদ্ধের মৃত্যুর পরেও আয়োজিত হয়েছিল।

ত্রিপিটক: শোনা যায় বুদ্ধের মৃত্যুর পরে তাঁর শিষ্যরা দুঃখে কাতর হয়ে উঠেছিল। সেইসময় সুভদ্র নামের এক শিষ্য আশ্বাস প্রকাশ করেন যে তাঁরা এখন নিজের মতো চলতে পারবেন। এই কথা শুনে আরেক শিষ্য মহাকাশ্যপ ভয় পান যে এইভাবে সবাই নিজের খুশিমতো চলতে থাকলে বুদ্ধের আদর্শ নষ্ট হবে। তখন তিনি সভা ডেকে প্রথম দুটি পিটক-এর সংকলন করান। পিটক শব্দের অর্থ হল ঝুড়ি। তিনটি ভাগের নাম হল—বিনয় পিটক, সূত্র পিটক ও অভিধর্ম পিটক। এর মধ্যে বিনয় পিটকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আচার-আচরণের নিয়ম নির্দেশ করা হয়েছে। সূত্র পিটকে বুদ্ধ ও তাঁর সন্ন্যাসীদের উপদেশ সংকলিত করা হয়েছে। সবশেষে অভিধর্ম পিটকে স্বয়ং গৌতম বুদ্ধের প্রধান উপদেশগুলির সংকলন করা হয়েছে। এই গ্রন্থটি পালি ভাষায় রচিত। একত্রে এই সংকলনকে ত্রিপিটক বলা হয়।

বৌদ্ধ ধর্ম পরে মহাযান ও হীনযান এই দুটিভাগে বিভক্ত হয়ে পরে। বেশ কিছু সন্ন্যাসী ভালো পোশাক পরে, ভালো খাওয়া-দাওয়া করে প্রায় পারিবারিক জীবনযাপন শুরু করে ফলে বৌদ্ধ ধর্মের নিয়ম তাঁদের কাছে শিথিল হয়ে পরে। এঁরা মহাযান হিসাবে নিজেদের চিহ্নিত করে। এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা বুদ্ধ মূর্তি পূজাকে সমর্থন করেন, কিন্তু আরেক সম্প্রদায় পুরোপুরিভাবে এঁদের বিরোধিতা করে তারা হীনযান হিসাবে চিহ্নিত হন।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে ত্রিরত্ন বলে ধারণা আছে। জৈনদের কাছে এটি সৎ, বিশ্বাস, জ্ঞান ও আচরণ আর বৌদ্ধধর্মে সেটি হল বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ। মহাবীরের সঙ্গে বুদ্ধের অনেক মিল ছিল। যেমন তাঁরা উভয়েই ক্ষত্রিয় পরিবারের হয়েও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচারের বিরোধিতা করে সর্বসাধারণের জন্য সহজ ভাবে ধর্মপ্রচার করেছেন। তবে তফাৎ হল এই যে জৈন ধর্মগ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় রচিত আর বৌদ্ধগ্রন্থ পালি ভাষায়। মহাবীরের মতে, কঠোর তপস্যাই মুক্তির উপায়, তবে বুদ্ধ বলেছেন, কঠোর তপস্যা যেমন নির্বান লাভের উপায় নয় তেমনই বেহিসাবি জীবনও কাম্য নয়, মধ্যপন্থার কথাই বলেছেন। তাঁরা উভয়েই নগরেই বেশি যেতেন ধর্মপ্রচারের জন্য, কারণ সেখানে একসঙ্গে অনেক মানুষ পাওয়া যেত, সেই সময় গ্রামের মানুষের নিজেদের গুটিয়ে রাখতেন।

গৌতম বুদ্ধ ত্রিপিটকে ৫০০-র বেশি জাতকের গল্পের মধ্যে দিয়ে নিজের উপদেশ গল্পের আকারে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন, যা থেকে তখনকার সমাজের বিষয়ে জানা যায়। গল্পগুলি পালিভাষায় বলা ও লেখা হতো এবং এর চরিত্র হিসাবে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে পশুপাখিরাও উঠে এসেছে।

আগামী সংখ্যায় থাকবে **'আমাদের স্কুল'** ও **'বিতর্ক যখন শিক্ষা নিয়ে'**। পড়তে থাকো উত্তরণ।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ৩ জানুয়ারি ২০১৭

ক্লাস সেভেন-এর টিউশন | বাংলা

কার দৌড় কদ্দুর

প্রাণিবিজ্ঞানী শিবতোষ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ১৯২৬ সালে। কলকাতার প্রেসিডেন্সি সহ দিল্লি এবং আমেরিকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেছেন। জুলজিক্যাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া, এশিয়াটিক সোসাইটি সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি সম্মান ও স্বর্ণপদক পেয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল 'উত্তরায়ণ', 'দিকবিদিক', 'আসা যাওয়ার পথ ধরে' ইত্যাদি। ১৯৯৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিষয়বস্তু: লেখক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই প্রাণিজগতের গতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথমেই তিনি বলেছেন, এই পৃথিবীর সব কিছুই গতিশীল, এমনকী পৃথিবী নিজেও ঘুরছে। একমাত্র গাছ স্থিতিশীল কারণ সে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়েই খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীদের খাবার সংগ্রহ করে খেতে হয়, তাই তারা গতিশীল। তবে এক-একজনের গতি এক-এক রকম। তাই সৃষ্টির আদিকাল থেকে এককোষী প্রাণী অ্যামিবা প্রোটোপ্লাজমের সাহায্যে গতিশীল। কিন্তু তার গতি মন্থর। অ্যামিবার সমগোত্রীয় প্রাণী প্যারামোসিয়ামও গতিশীল সিলিয়ার সাহায্যে। এরপর লেখক পশুপাখির গতি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, কোনও কিছুর গতি নির্ভর করে তার ওজনের ওপরেও। তিনি মনকে পৃথিবীর সবথেকে দ্রুতগামী বলেছেন এবং বলেছেন মনের বাসনা তৃপ্তির জন্য মানুষও দেশদেশান্তর ঘুরে বেড়ায়। আবার পৃথিবীও এমন দৌড়য় যেন সূর্য তার পেছনে তাড়া করেছে। উপনিষদে 'চরৈবেতি' শব্দের অর্থ এগিয়ে যাওয়া, লেখক তাই এই সব কিছুর এগিয়ে যাওয়াকে চরৈবেতি বলেছেন।

শব্দার্থ: বরাহ –শুয়োর, মন্দগতি –ধীরে এগিয়ে চলা, এক পাউন্ড –৪৩৫ গ্রাম, স্থানু –স্থির, রসনা –জিহ্বা, চরৈবেতি -- এগিয়ে চলা, মার্চ – সেনাবাহিনীর সারিবদ্ধভাবে চলা, কলাকুশলিত –কলাকৌশল।

প্রশ্নোত্তর:

১) এফিড টানা কত কিলোমিটার যেতে পারে?
উত্তর: এফিড টানা প্রায় ১৩ কিমি যেতে পারে।

২) অ্যামিবা ও প্যারামোসিয়াম কীসের সাহায্যে চলে?
উত্তর: অ্যামিবা চলে প্রোটোপ্লাজমের সাহায্যে আর প্যারামোসিয়াম চলে সিলিয়ার সাহায্যে।

৩) পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী জিনিস কী?
উত্তর: পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী জিনিস মন যার গতিবেগ ঘণ্টায় ১৮,৬০০০ মাইল।

৪) আইনস্টাইন কোন শতাব্দীর মানুষ ছিলেন?
উত্তর: আইনস্টাইন অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষ ছিলেন।

৫) শামুক চলে যাবার সময় রেখে যায় 'জলীয় চিহ্ন'-সেটি কী?
উত্তর: সেটি হল শামুকের মুখের লালা।

৬) আমাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে একরকম 'ভবঘুরে সেল আছে'—সেলটিকে 'ভবঘুরে' বলা হয়েছে কেন?
উত্তর: ভবঘুরে সেলটি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে তাই একে ভবঘুরে বলা হয়েছে।

৭) নানা জাতের খরগোশের মধ্যে গতির তারতম্য দেখা যায়—খরগোশ জাতীয় অপর একটি প্রাণীর নাম লেখো।
উত্তর: খরগোশ জাতীয় অপর একটি প্রাণী হল গিনিপিগ।

৮) অ্যামিবা ও প্যারামোসিয়াম ছাড়া অন্য একটি এককোষী প্রাণীর নাম লেখো।
উত্তর: অন্য একটি এককোষী প্রাণী হল প্রোটোজোয়া।

৯) গমনে সক্ষম গাছ ও গমনে অক্ষম প্রাণীর নাম লেখো।
উত্তর: গমনে সক্ষম গাছ—ভলবক্স, শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ।
গমনে অক্ষম প্রাণী—স্পঞ্জ, ক্ল্যামাইডোমোনাস।

১০) 'হক' জাতীয় পাখি কোনগুলি?
উত্তর: শকুন, ঈগল, বাজ এগুলি 'হক' জাতীয় প্রাণী।

১১) আফ্রিকায় কোন জাতীয় প্রাণী হাঁটায় পারদর্শী?
উত্তর: ইন জাতীয় প্রাণী।

১২) ক্রমবিকাশের ধারায় ঘোড়ার কোন পরিবর্তন হয়েছে?
উত্তর: ক্রমবিকাশের ধারায় ঘোড়ার আঙুলের পরিবর্তে খুর তৈরি হয়েছে।

টীকা: ভাস্কো-ডা-গামা: ভাস্কো-ডা-গামা পর্তুগিজ নাবিক ছিলেন। ১৪৯৮ সালে তিনি কালিকট বন্দরে আসেন। বলা হয় তিনিই প্রথম ভারত ও ইউরোপের জলপথ আবিষ্কার করেন। এছাড়াও তিনি উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার করেন।

হিউয়েন সাং: হিউয়েন সাং চিনের অধিবাসী। তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তথা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বে ভারত ভ্রমণে এসে একটি ভারত ভ্রমণ গ্রন্থ রচনা করে দেশে ফিরে যান।

১) এরকম মনে করলে ভুল হবে— লেখক কোন প্রসঙ্গে একথা বলেছেন?
উত্তর: পাখি হালকা হওয়ায় তীরের মতো যায় কিন্তু অনেক ওজনের হিপোর কাদা ভেঙে থপ থপ করে যেতে অনেক সময় লাগে। এই প্রসঙ্গে আলোচনার সময় লেখক একথা বলেছেন।

২) উঁচু প্রাণীদের পেশী কীভাবে শক্তি উৎপাদন করে?
উত্তর: উঁচু প্রাণীদের পেশি যখন কাজ করে তখন এডিনোসিন ট্রাইফসফেট নামক এক রাসায়নিক পদার্থের উৎপত্তি হয়, যার রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্তি উৎপন্ন হয়।

৩) এ পথে আমি যে গেছি--এটি কার গাওয়া গানের লাইন এবং কোন প্রসঙ্গে লেখক এই কথা বলেছেন?
উত্তর: উপরোক্ত লাইনটি রবীন্দ্রনাথের লেখা। লেখক শামুকের গতি প্রসঙ্গে বলেছেন যে সে যাওয়ার সময় জলপথে চিহ্ন রেখে যায়। এই প্রসঙ্গেই লেখক এই লাইনটি উল্লেখ করেছেন।

৪) ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানা যায়— কোন প্রসঙ্গে লেখক এই কথা বলেছেন?
উত্তর: লেখক ঘোড়ার গতি প্রসঙ্গে এই কথা বলেছেন। ঘোড়ার আগে খুর ছিল না আঙুল ছিল। ক্রমবিকাশের ফলে এই খুরের আবির্ভাব হয়েছে।

ক্লাস সেভেন-এর টিউশন | ভূগোল

মাটি দূষণ

এই পৃথিবীর তিনভাগ জল ও একভাগ স্থল। এই স্থলভাগের মূল হল মাটি। স্থলভাগের উপরের স্তরে থাকে মাটি। কয়েক হাজার বছর ধরে প্রাকৃতিক শক্তির কারণে শিলা ক্ষয় পেয়ে মাটি তৈরি হয়। আমাদের এই উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতকে মাটি ধারণ করে আছে। মানুষ, উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণিজগতের বাসস্থান থেকে শুরু করে খাবার সংস্থান ও জীবন সবটাই মাটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

তবে, ইদানীংকালে মাটি দূষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, একটি গাছের টবের মাটিতে যদি বিষাক্ত কিছু মিশিয়ে দেওয়া হয় তবে গাছটি কয়েকদিনের মধ্যে মারা যাবে। আমাদের পৃথিবীর মোট স্থলভাগের মাত্র ১০ শতাংশের মধ্যে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ মানুষ বাস করেন। মানুষের সচেতনতার অভাবে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে মাটির অতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে মাটির ক্ষয় এবং দূষণ হচ্ছে ব্যাপক হারে।

মাটি দূষণের উৎস সন্ধান করলে যে-কটি মূল কারণ চোখে পড়ে তা হল—

১) **নগরায়ন:** জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাসস্থানের চাহিদাও বেড়েছে, আর সঙ্গে বেড়েছে বৃক্ষচ্ছেদন। এর জন্য মাটির ক্ষয় হয়ে হচ্ছে মাটি দূষণ।

২) **কৃষিকাজ:** জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের প্রয়োজন বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে বাড়াতে হয়েছে উৎপাদন। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার হয় প্রচুর পরিমাণে, যার কারণে খাদ্যের গুণ নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটির পোকামাকড় মারা যায়, জৈব পদার্থের অভাব দেখা দেয় এবং মাটির গুণমান নষ্ট হয়। আবার কখনও একই শস্যের বহুবার চাষের জন্য মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়।

৩) **শিল্প উপাদন:** জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে শিল্পজাত দ্রব্যের

চাহিদার জন্য যেমন শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি কারখানার বর্জ্য মাটি ভূগর্ভস্থ জলকে করছে দূষিত। শুধু তাই নয় কারখানার বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে মিশে অ্যাসিড বৃষ্টি হয় যা মাটিতে মিশে মাটিকে করে তোলে বিষাক্ত।

৪) **গৃহস্থালি:** বাড়ি, বাজার, হাসপাতালের আবর্জনাস্তূপে নানারকম ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস জন্মায়, শৌচাগারের মলমূত্র মাটিতে মিশলে নানারকম জীবাণু সৃষ্টি করে। প্লাস্টিক আবার মাটিতে মিশতে চায় না, এর বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ মাটির সঙ্গে বিক্রিয়া করে মাটিকে দূষিত করে।

৫) **যানবাহন:** দিন দিন যানবাহন যেভাবে বেড়ে চলেছে তার সঙ্গে বেড়ে চলেছে তার বিষাক্ত ধোঁয়া। ফলে দূষিত হচ্ছে বায়ু এবং তা থেকে হচ্ছে মাটি দূষণ।

৬) **তাপবিদ্যুৎ ও পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র:** তাপবিদ্যুৎ ও পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ছাই, তেজস্ক্রিয় পদার্থ মাটিতে মিশে মাটির ক্ষতি যেমন করে তেমনই তা ফসলের মধ্যে ঢুকে মানুষের শরীরে রোগ সৃষ্টি করছে। আবার ইটভাটার ইট তৈরির জন্য অতিরিক্ত মাটি কাটার জন্য মাটি ক্ষয়ও হচ্ছে।

১৯৮৪ সালের ডিসেম্বরে একদিন মাঝরাতে ভারতের ভোপালে ইউনিয়ন কার্বাইড-এর কারখানা থেকে অতি বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে মেশে। এর ফলে প্রচুর মানুষ মারা যায়। সুতরাং আমরা যদি এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে না দেখি তাহলে এরকম বিপদ আমাদের ভবিষ্যতেও হতে পারে। এর থেকে মুক্তি পেতে গেলে আমাদের মাটি দূষণ প্রতিরোধ করতে হবে, এর জন্য আমাদের পরিবেশ, তার উপাদান এবং আমাদের নিজেদের কাজকর্ম সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

১) এর জন্য আমাদের গৃহস্থালির আবর্জনা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা উচিত। যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেললে দেখতে যেমন খারাপ লাগে, তেমনি মাটি দূষণের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ দূষণও হয়।

২) পলিথিনের বদলে কাগজ বা পাটের থলে ব্যবহার করা অনিবার্য।

৩) আমাদের বাড়ির উঠোন, বাগান, রাস্তার ধারে অনেক বেশি করে গাছপালা লাগানো দরকার। বর্তমানে যেহারে গাছ কাটা হচ্ছে তার প্রভাব ইতিমধ্যেই আমরা দেখছি গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর মধ্যে দিয়ে। সুতরাং এই বিষয়েও আমাদের সচেতন হতে হবে।

৪) কৃষিজমিতে রাসায়নিক সার কমিয়ে জৈব সারের পরিমান বাড়ানো প্রয়োজন।

৫) স্কুলের বা বাড়ির আশেপাশের মানুষকে এই বিষয়ে আরও সচেতন হতে হবে। কারণ সবাই মিলে এগিয়ে না আসলে এই বিপদের সঙ্গে একা লড়াই করা সম্ভব না।

৬) শৌচাগার ছাড়া যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করা বন্ধ করতে হবে। এই বিষয়ে সরকারও এখন সাহায্য করছে, শৌচাগার বানানো হচ্ছে সরকারি প্রচেষ্টায়। নানা ভাবে এই বিষয়ে মানুষকে সচেতনও করা হচ্ছে। সুতরাং তাদেরও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে পরিবেশের প্রতি।

স্মরণীয় যাঁরা
(৩ জানুয়ারি - ৯ জানুয়ারি)

সংগীত পরিচালক এবং সুরকার
রাহুল দেববর্মন
জন্ম: জুন ২৭, ১৯৩৯, **মৃত্যু: জানুয়ারি ৪, ১৯৯৪**)

শচীন আর মীরা দেববর্মনের ঘরে জন্ম হয়েছিল তাঁর। অশোককুমার পঞ্চম নামটা দিয়েছিলেন।
বীর সাংভি লিখেছিলেন যে, দুনিয়া জুড়ে ষাটের দশককে যৌবনের দশক বলে বাড়াবাড়ি করা হয়। ভারতে কিন্তু যৌবনের দশক বলতে সত্তরের দশক। আর সত্তরের দশক মানেই পঞ্চমের দশক।
ভারতীয় চলচ্চিত্রের সংগীতে ইলেকট্রিক গিটার, রক অ্যান্ড রোলের সংমিশ্রণ ঘটান তিনি।
তেত্রিশ বছরের পেশাদার জীবনে তিনি ২৯২টি হিন্দি, ৩১টি বাংলা, তিনটি তেলুগু, দুটি করে তামিল ও ওড়িয়া এবং একটি মরাঠি ছবির সংগীত পরিচালনা করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'শোলে', 'গোলমাল', 'সনম তেরি কসম', 'মাসুম', 'ইয়াদোঁ কি বারাত', 'খুবসুরত', '১৯৪২ এ লাভ স্টোরি', 'ক্যারাভান', 'আপ কি কসম', 'খেল খেল মে', 'মেহবুবা', 'হাম কিসিসে কম নহি', 'কিনারা', 'শালিমার', 'শান', 'বেতাব', 'সাগর' প্রভৃতি। এর মধ্যে '১৯৪২ এ লাভ স্টোরি' মুক্তির আগেই তাঁর প্রয়াণ হয়।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ৩ জানুয়ারি ২০১৭

স্মরণীয় যাঁরা
(৩ জানুয়ারি - ৯ জানুয়ারি)

স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বিপ্লবী
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ
(জন্ম: ৫ জানুয়ারি, ১৮৮০, মৃত্যু: ১৮ এপ্রিল, ১৯৫৯)

তাঁর জন্ম লন্ডনের নরউড-এ। তিনি কৃষ্ণধন ঘোষ ও স্বর্ণলতা ঘোষের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। বরোদায় থাকাকালীন তিনি রাইফেল চালনায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ইতিহাস ও রাজনীতি নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেন। অগ্রজ অরবিন্দ ঘোষ-এর সান্নিধ্যে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯০৬ সালে বিপ্লবী চেতনা সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বারীন ঘোষ 'সাপ্তাহিক যুগান্তর পত্রিকা' প্রকাশ করেন। যুব সমাজের মধ্যে যুগান্তরের জনপ্রিয়তা ব্রিটিশ সরকারকে সন্দিহান করে তোলে। বেশ কয়েকবার রাজনৈতিক হয়রানির স্বীকার হলেও তিনি ছিলেন অদম্য। ১৯০৭ সালে অল্প কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ যুবককে নিয়ে তিনি মানিকতলা বিপ্লবী দলটি গঠন করেন। ১৯০৮ সালে অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে বারীন গ্রেফতার হন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে তাঁকে আন্দামানে পাঠানো হয়। মুক্তির পর তিনি 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন এবং লেখক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। পরে তিনি 'বসুমতী'র সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ক্লাস এইট-এর টিউশন | ইংরেজি

A King's Tale

কয়েকশো বছর আগে কিং আর্থার নামে ব্রিটেনের এক রাজা ছিলেন। তার নামে বহু কাহিনি প্রচলিত ছিল, তার মধ্যে একটি হল রাজা আর্থার, পেনড্রাগন ইগরেইন নামে এক সুন্দর রমণীকে বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁদের এক সন্তান হয় যে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ছিল। কিন্তু রাজা-রানি হঠাৎ মারা গেলে প্রতিপক্ষরা সিংহাসন দখল করতে চায়। এই সময় রাজার দুই বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা মারলিন ও উলফিয়াস রাজপুত্রকে রাজারই এক বিশ্বস্ত অনুচর এক্টরকে নিজের ছেলের মতো মানুষ করতে আদেশ দেয়। নাম দেয় আর্থার।

ব্রিটেনে চরম অরাজকতা শুরু হল। আর্থার বড় হয়ে উঠল। একবার ক্রিসমাসের সময় গির্জার সামনে এক তরবারি গাঁথা ছিল যা আর্থার টেনে বার করে। পুনরায় তার পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁকে রাজা করা হয়। একবার রাজা যুদ্ধ করতে করতে তাঁর তরবারি হারিয়ে ফেলেন। এরপর মার্লিনের দেখানো রাস্তায় গিয়ে এক হ্রদের মধ্যে সুন্দর হাত তাঁকে এক তরবারি দেয় যার নাম এক্সক্যালিবার। আর্থার ব্যক্তিগত কারণে ব্যবহার না করার প্রতিশ্রুতি দেন। বিয়ের পরে তাঁর শিবিরে এক গোল টেবিল ছিল যা পরবর্তীতে বিখ্যাত হয়েছিল। এরপর রাজা বৃদ্ধ হন ও এক্সক্যালিবারকে সম্মানের সঙ্গে সেই হ্রদে ফেরত দিয়ে তিনি রাজ্য থেকে বিদায় নেন।

শব্দার্থ: Flocks-মেষের পাল, seize- ক্লোক করা, rivalry-শত্রুতা, craftsmen- কারিগর, slender-সরু ও লম্বা, perished-নষ্ট হওয়া, amid-মধ্যে, barge-বজরা, twilight-গোধূলি, eager-আগ্রহী।

Question and Answer:

1. Whom did the king Uther-Pendragon marry?

Ans: The king Uther-Pendragon married the beautiful lady Igrain.

2. What kind of King Uther-Pendragon was?

Ans: Uther-Pendragon was a generous king. He was friend and protector to all his people and was fair to everyone.

3. Who was sir Ector?

Ans: Sir Ector was a trustworthy and loyal subject of the King Uther-Pendragon.

4. Who were two counselors of the king Uther-Pendragon?

Ans: The prophet and magician, Merlin and a brave Knight Sir Ulfius were two counselors of the King Uther-Pendragon.

5. How did people of Britain spend their life under the King Uther-Pendragon?

Ans: The people of Britain lived in peace and happiness by tending their flocks and tilling their fields under the rule of the King Uther-Pendragon.

6. When did the King and the Queen die?

Ans: The King and the Queen died soon after their baby boy was born.

7. When and why did the two counselors go to Sir Ector?

Ans: The two counselors went to Sir Ector to hand him over the royal baby.

8. Who was Arthur?

Ans: Arthur was the son of the late King Uther-Pendragon.

9. Where was a large stone found? What was fixed on it?

Ans: A large stone was found in a churchyard. A magnificent stone was fixed on it.

10. What happen when Arthur approaches the lake?

Ans: When Arthur approached the lake a beautiful arm with golden bracelets rose from the water and held a sword.

11. What was there in the middle of the room where Merlin took Arthur on his wedding day?

Ans: In the middle of the room, there was a huge, round, oak table, richly carved and capable of serving fifty people.

12. Which stories were spread throughout the country?

Ans: The stories of goodness and kindness of King Arthur's devoted Knights spread throughout the country.

Change the voice.

1. Rina learned the poem.

Ans: The poem was learned by Rina.

2. The man is making a big mistake.

Ans: A big mistake is being made by the man.

3. Tears filled her eyes.

Ans: Her eyes were filled with tears.

4. They play cricket every day.

Ans: Cricket is played by them every day.

Show the clause

1. She makes friends wherever she goes.

Ans: She makes friends [wherever she goes].

2. It is clear that he is guilty.

Ans: It is clear [that he is guilty].

ক্লাস এইট-এর টিউশন | বিজ্ঞান

ধাতু ও অধাতুর বৈশিষ্ট্য

মৌলের ধর্ম জানার জন্য তাদের বাহ্যিক ধর্মগুলি জানা দরকার, যাকে ভৌত ধর্ম বলে। আবার কোনও পদার্থের অন্য পদার্থের সঙ্গে বিভিন্ন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার প্রবণতা ও ক্ষমতাকে ওই পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম বলে।

ধাতু ও অধাতুদের উজ্জ্বলতা: ধাতুগুলি উজ্জ্বল ও চকচকে। আয়োডিন অধাতু হলেও উজ্জ্বল। অন্যান্য অধাতুগুলি অনুজ্জ্বল।

ধাতু ও অধাতুদের কাঠিন্য: সব ধাতুর কাঠিন্য একরকম নয়। পারদ ধাতু হলেও তরল এবং ব্রোমিন অধাতু হয়েও তরল। বেশির ভাগ অধাতু গ্যাসীয়। যেমন—অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি।

ধাতু ও অধাতুদের নমনীয়তা: ধাতুর নমনীয়তার জন্য ধাতুগুলিকে পিটিয়ে পাত বানানো যায়। সোনা ও রুপোর নমনীয়তা সবচেয়ে বেশি। অধাতুগুলির নমনীয়তা নেই, তাই অধাতু গুঁড়ো হয়ে যায়।

ধাতু ও অধাতুর প্রসারণশীলতা: সব ধাতুর প্রসারণশীলতা এক নয়। কিছু ধাতুর প্রসারণশীলতার জন্য ওইসব ধাতু থেকে তার তৈরি করা যায়। সোনার প্রসারণশীলতা বেশি হওয়ায় ১ গ্রাম সোনা থেকে ২ কিলোমিটার লম্বা তার তৈরি করা যায়।

ধাতু ও অধাতুর তাপ পরিবাহিতা: ধাতুগুলি তাপের সুপরিবাহী এবং আধাতুগুলি তাপের কুপরিবাহী। তবে গ্রাফাইট অধাতু হলেও তাপের সুপরিবাহী।

উপরোক্ত সমস্ত ভৌতধর্ম দিয়ে ধাতু ও অধাতুকে শনাক্ত করা যায় না, কারণ ধাতু ও অধাতুর ভৌত ধর্মের নানা অমিল যেমন আছে তেমন মিলও আছে।

সাধারণ তাপমাত্রায় বেশির ভাগ ধাতু উচ্চ গলনাঙ্ক বিশিষ্ট কঠিন পদার্থ হলেও পারদ সাধারণ তাপমাত্রায় তরল। গ্যালিয়াম ও সিজিয়াম ধাতু হলেও এদের গলনাঙ্ক যথাক্রমে ২৯.৭৮°সেন্টিগ্রেড ও ২৮.৪°সেন্টিগ্রেট।

লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম ধাতু হলেও অন্য ধাতুদের মতো কঠিন না। অধাতুরা অনুজ্জ্বল হলেও, কেলাসিত আয়োডিনের উজ্জ্বলতা আছে। কার্বন অধাতু, কিন্তু বিভিন্নরূপে থাকতে পারে। একে কার্বনের রূপভেদ বলে। কার্বনের দুটি রূপভেদ হিরে ও গ্রাফাইট। হিরে উজ্জ্বল ও সবথেকে কঠিন প্রকৃতিজাত পদার্থ, কিন্তু তড়িতের কুপরিবাহী। গ্রাফাইট নরম ও পিচ্ছিল হলেও তাপ ও তড়িতের সুপরিবাহী। সুতরাং ধাতু ও অধাতুদের শনাক্ত করতে ভৌতধর্মই যথেষ্ট নয়। রাসায়নিক ধর্মও জানা প্রয়োজন।

ধাতু ও অধাতুগুলিকে বায়ুতে দহন করলে উৎপন্ন অক্সাইডের প্রকৃতি থেকে ধাতু ও অধাতু চেনা যায়। বেশির ভাগ ধাতব অক্সাইড ক্ষারকীয় ও বেশির ভাগ অধাতব অক্সাইড অ্যাসিডিক প্রকৃতির। তবে অ্যালুমিনিয়াম ও জিংক-এর অক্সাইডগুলিতে ক্ষারকীয় ও অ্যাসিডিক উভয় গুণই বর্তমান। তাই এদের উভধর্মী অক্সাইড বলে। আবার কার্বন মনোক্সাইডে ক্ষারকীয় ও অ্যাসিডিক কোনও ধর্মই বর্তমান না থাকায় এরা প্রশম প্রকৃতির।

জলের সঙ্গে ধাতু ও অধাতুর বিক্রিয়া: সোডিয়াম, পটাসিয়াম ঠান্ডা জলের সঙ্গে তীব্র বিক্রিয়ায় একই ধরনের গ্যাস উৎপন্ন করে ও প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়, যা ধাতুতে আগুন লাগাতে সক্ষম। ক্যালসিয়ামের সাথে ঠান্ডা জলের বিক্রিয়ার তীব্রতা কম এবং লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, জিংক ঠান্ডা বা গরম জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না। কিন্তু এরা স্টিমের সঙ্গে বিক্রিয়ায় ধাতব অক্সাইড ও গ্যাস উৎপন্ন করে। সিসা, তামা, রুপো কোনও অবস্থাতেই জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না।

ধাতু ও অধাতুর সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়া: জিংকের সঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় জিংকের লবণ ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহার করলে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় না। সোডিয়াম, পটাসিয়ামের সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়া তীব্র হওয়ায় এই বিক্রিয়া বিপজ্জনক।

বিভিন্ন ধরনের ধাতুর অ্যাসিড থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপাদনের ক্ষমতা থেকে দেখা যায় সব ধাতুর সক্রিয়তা সমান নয়, ধাতুদের সক্রিয়তার ক্রম হাইড্রোজেনের সাপেক্ষে নীচে দেওয়া হল। তালিকার বামদিকের ধাতু সবচেয়ে সক্রিয়।

পটাসিয়াম → সোডিয়াম → ক্যালসিয়াম → ম্যাগনেসিয়াম → অ্যালুমিনিয়াম → জিংক → লোহা → লেড (H) → তামা → পারদ → রুপো → সোনা

সক্রিয়তার ক্রম থেকে জানা যায় যারা হাইড্রোজেনের বাঁদিকে আছে, তারা অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। আবার তালিকার বাঁদিকে থাকা কোনও মৌল ডানদিকের মৌলের যৌগ থেকে তাকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে। যেমন—কপার সালফেট দ্রবণে একটি লোহার পেরেক ডোবালে দেখা যাবে যে লোহার পেরেকের গায়ে লালচে বাদামি রঙের ধাতব কপারের একটি আস্তরণ পড়েছে।

$Fe + CuSO4 \rightarrow FeSO4 + Cu$

সংবিধান সভা

ফরাসি বিপ্লবে বাস্তিলের পতনের পর নতুন যে-সব পরিবর্তন হয়েছিল সেগুলো এবার আমাদের জানতে হবে। ১৭৮৯ সালের ১৭ জুন স্টেটস জেনারেল অধিবেশনে বুর্জোয়ারা তাদের সভাকে 'জাতীয় সভা' বলে ঘোষণা করে। ৯ জুলাই থেকে জাতীয় সভা সংবিধান সভার মর্যাদা পায়। এই সভার প্রতিনিধিগণ ২ বছরের মধ্যে এই সংবিধান রচনা করেন। এতে রাজতন্ত্রের পতন হয়ে প্রজাতন্ত্র শুরু হয়। এখানে রাজার ক্ষমতাকে হ্রাস করে আইন সভার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ফ্রান্সকে ৮৩টি প্রদেশে ভাগ করা হয়, প্রদেশগুলিকে জেলায়, জেলাগুলি ক্যান্টন ও ক্যান্টনগুলি কমিউনে বিভক্ত হয়। জনগণকে সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার দেওয়া হয় এবং তাদের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়।

নব সংবিধান অনুযায়ী আইনসভার অধিবেশন বসে এই সভা ৪টি দল গঠন করে-- দক্ষিণপন্থী শাসনতান্ত্রিক দল, জিরোন্ডিস্ট দল, জ্যাকোবিন দল ও মধ্যপন্থী নিরপেক্ষ দল। আইন অভিজাত ও 'সিভিল কনস্টিটিউশন অব দ্য ক্লার্জি' অমান্যকারী যাজকদের স্বার্থবিরোধী আইন রচনা করেন। এর আগে রাজা অস্ট্রিয়া রাজের কাছে সাহায্য চাওয়ার জন্য পালাতে গিয়ে ধরা পরেন। বিপ্লবীরা রাজাকে আটক করে। এর পরেই শুরু হয় মতবিরোধ। জ্যাকোবিন উগ্রপন্থীরা রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করতে চায় কিন্তু বুর্জোয়ারা তার বিরোধিতা করে। বিপ্লবীদের ভয় ছিল রাজার সঙ্গে অস্ট্রিয়ার যোগ আছে, এই অবস্থায় অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার রাজা ফরাসি রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করলে ঝামেলা বাঁধে। আইনসভার চাপে রাজা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে বিপ্লবীরা রাজপ্রাসাদে আক্রমণ করে। রাজপরিবারকে বন্দি করা হয়। এটি দ্বিতীয় ফরাসি বিপ্লব নামে পরিচিত, রাজানুরাগী বহু মানুষকে হত্যা করা হয়। এই ঘটনাকে 'সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড' নামে অবিহিত করা হয়।

রাজতন্ত্রের পতনের পর জিরোন্ডিস্ট ও জ্যাকোবিন দলগুলির প্রাধান্যে নতুন সংবিধানের দাবি করে তাতে তর্কবিতর্কের পর ভোটের দ্বারা ষোড়শ লুইকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর আসে বিপ্লবী সরকার যে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শে কাজ করে। কিন্তু এতে ফ্রান্সে অরাজকতা ও কালোবাজারি ছেয়ে যায়। জনগণ সব বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করে বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইউরোপের অন্যান্য রাজারা ফ্রান্স আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে এবং ফরাসি সেনাপতি তাদের সঙ্গে হাত মেলায়। এই অরাজকতার সময়ে জাতীয় সম্মেলনের নেতারা 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' নামে এক শাসনব্যবস্থা চালু করে যাতে শাসনভার কয়েকটি কমিটির উপর দেওয়া হয়। তারা কিছু নতুন আইন লাগু করেন। এর ফলে জিরোন্ডিস্টকে দমন করে জ্যাকোবিন দলের একাধিপত্য চলে আসে।

জ্যাকোবিন দল রোবসপিয়রের নেতৃত্বে 'প্রজাতান্ত্রিক বর্ষপঞ্জি' চালু করেন। সর্বোপরি অনেক নতুন আইন চালু করেন ধর্মনিরপেক্ষ সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করেন। কিন্তু ক্রমে তাঁদের ভয়ংকরতা বাড়ে। সন্দেহের আইন দিয়ে অনেক মানুষকে হত্যা করা হয়। অনেক বিপ্লবী খুন হয়। এমনকী রোবসপিয়রও। সন্ত্রাসের বাড়াবাড়ির জন্য তারা

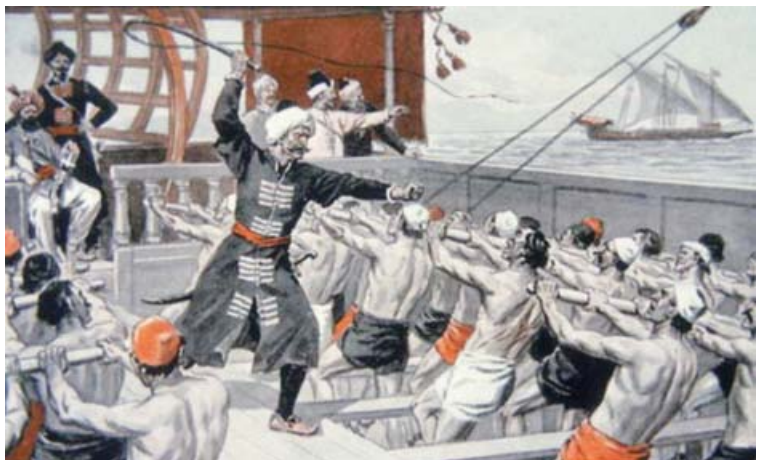

জনসমর্থন হারায়। ভালো-খারাপ দুই দিকই ছিল তাদের শাসনের।

ফরাসি বিপ্লব ছিল জনগণের স্বৈরাচারী রাজার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। ১৭৮৯-'৯১ এই আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। বিভিন্ন ক্লাব, সংবাদমাধ্যম, পত্রিকা এতে উৎসাহ জুগিয়েছে। এরপর ফরাসি জনগণ সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শে এগিয়ে যান। এরপর বিপ্লবী সরকার প্রমাণ করে যে জনগণই সকল ক্ষমতার মূল। এইভাবেই ফ্রান্সের রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন আসে এবং ফ্রান্স মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে পদার্পণ করে।

ফরাসি সমাজ ব্যবস্থায় সবথেকে শোষিত ছিল তৃতীয় শ্রেণি বা কৃষক সম্প্রদায়। ফ্রান্সের অন্যতম দার্শনিক ভলতেয়ার বিদ্রূপাত্মক রচনা করে নানা দুর্নীতিকে জনগণের সামনে তুলে ধরেন। অপরজন ছিলেন জাঁ-জেকুইশ-রুশো, তিনি আদর্শ বিপ্লবী এবং বিপ্লবীদের মন্ত্রগুরু। 'অসাম্যের সূত্রপাত' গ্রন্থে তিনি লেখেন মানুষ স্বাধীনসত্তা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সর্বত্র সে শিকল দ্বারা আবদ্ধ। এই সময় 'ফিজিওক্রাটস' নামে একদল অর্থনীতিবিদের আবির্ভাব হয় যাঁদের মধ্যে কুইসন ছিলেন প্রধান প্রবক্তা, যাঁর মতবাদ শিল্পপতিদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সেই সময় বুর্জোয়া শ্রেণির মানুষরা ছিল অবহেলিত ও করভারে জর্জরিত। বিদ্যা-বুদ্ধি অর্থ থাকলেও তারা ছিল চরম অসাম্যের শিকার। যাজক ও অভিজাতদের সাথে তৃতীয় শ্রেণির আর্থিক বৈষম্য ছিল অনেক বেশি।

রাজার আমলে যে আর্থিক বৈষম্য ছিল, বিপ্লবের ফলে তার পরিবর্তন হয়। সেই সময় রাজারা মনে করতেন স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে রাজা করেছেন। এভাবেই তাঁরা বংশপরম্পরায় শাসন করতেন। এইসব অত্যাচারের ফলেই পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়।

উত্তরণ
আয়োজন করছে
স্কুলের সেরা সরস্বতী পুজো প্রতিযোগিতা
এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের বিস্তারিত তথ্য জানতে লক্ষ্য রাখো পরের সপ্তাহের
উত্তরণ

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ৩ জানুয়ারি ২০১৭

স্মরণীয় যাঁরা
(৩ জানুয়ারি - ৯ জানুয়ারি)

কণ্ঠশিল্পী ও মঞ্চাভিনেত্রী
আঙুরবালা দেবী
(জন্ম: জুলাই, ১৯০০, **মৃত্যু: ৭ জানুয়ারি, ১৯৮৪**)

তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল প্রভাবতী দেবী। তাঁর জন্ম কলকাতার কাশীপুরে। মেধাবী ছাত্রী হিসাবে স্কুলে ছাত্রীবৃত্তি পরীক্ষায় জলপানি লাভ করেন। সংগীতপ্রতিভা ছিল তাঁর সহজাত। সুকণ্ঠের অধিকারী হওয়ায় শৈশবেই সংগীত সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। খেয়াল, ঠুমরি, দাদরা ও গজলে একাধিক গুণী ওস্তাদের কাছে তামিল গ্রহণ করেন। কিশোরী বয়সেই গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে গানের রেকর্ড প্রকাশ হয়। ঈশাণ ঠাকুরের কাছে কীর্তন, জমিরুদ্দিন খাঁ-র কাছে গজল ও দাদরা এবং কাজী নজরুল ইসলামের কাছে নজরুলগীতি শিখেন। অজস্র হিন্দি ও বাংলা গানে কণ্ঠদান করেন। তাঁর গাওয়া রেকর্ডের সংখ্যা আনুমানিক পাঁচশো। অভিনেত্রী হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করেন। মিনার্ভা থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত থেকে অসংখ্য নাটকে অভিনয় করেন।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ৩ জানুয়ারি ২০১৭

স্মরণীয় যাঁরা
(৩ জানুয়ারি - ৯ জানুয়ারি)

বিশিষ্ট সাহিত্যিক
আশাপূর্ণা দেবী
(জন্ম: ৮ জানুয়ারি, ১৯০৯,
মৃত্যুঃ- ১৩ জুলাই, ১৯৯৫)

আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম কলকাতায়। পিতা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। মা সরলাসুন্দরী দেবীর সাহিত্যপাঠই ছিল জীবনের একমাত্র পরমার্থ'। বাড়িতে আসত শিশুসাথী, সন্দেশ প্রভৃতি ১৬-১৭টি পত্রিকা। বই পড়াই ছিল দৈনিক জীবনের আসল কাজ। তাঁর রচনার মূল বিষয় ছিল বিংশ শতাব্দীর সাধারণ বাঙালি নারীর জীবন ও মনস্তত্ত্ব। বঞ্চিত হয়েছিলেন প্রথাগত শিক্ষালাভে। কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণশক্তির দ্বারা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেন। প্রতিশ্রুতি-সুবর্ণলতা-বকুলকথা উপন্যাসত্রয়ী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ১৯২২ সালে শিশু সাথী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর কবিতা 'বাইরের ডাক'। দেড় হাজার ছোটগল্প ও আড়াইশোর বেশি উপন্যাস রচনা করেছেন। সম্মানিত হয়েছেন জ্ঞানপীঠ, রবীন্দ্র সহ একাধিক সাহিত্য পুরস্কার, অসামরিক নাগরিক সম্মান ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রিতে। ভারতের সর্বোচ্চ সাহিত্য সম্মান সাহিত্য অকাদেমি ফেলোশিপে ভূষিত হয়েছেন।

ক্লাস টেন-এর টিউশন | ভূগোল

বায়ুমণ্ডলের তাপ, উষ্ণতা ও বিশ্ব উষ্ণায়ন

সাধারণত কোনও স্থানের জলবায়ু নির্ভর করে সেই স্থানের বায়ুর উষ্ণতার উপর। আর বায়ুর উষ্ণতা নির্ভর করে সূর্যরশ্মির উপর।

সূর্যরশ্মির তাপীয় ফল: পৃথিবীতে সূর্যরশ্মির খুব সামান্য অংশই ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছয়। একে বলে সূর্যের তাপীয় ফল বা আগত সৌরকিরণ।

উত্তাপের সমতা: সূর্যতাপে সকালে ভূপৃষ্ঠ গরম হয় ও রাতে সেই তাপ বিকিরণ করে ঠান্ডা হয়। ফলে পৃথিবীর গড় বার্ষিক উষ্ণতা কখনও খুব বাড়ে বা কমে না। একেই পৃথিবীর উত্তাপের সমতা বলে।

উত্তপ্ত হওয়ার পদ্ধতি: সূর্যরশ্মির ৩৪% ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায়। একে পৃথিবীর অ্যালবেডো বলে। আগত সৌরকিরণের ১৯% বায়ুমণ্ডল সরাসরি শোষণ করে আর বাকি ৪৭% ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছয়। অতএব শতকরা ৬৬% বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে।

সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতা: গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ বা সিক্স-র থার্মোমিটারের সাহায্যে দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতা ডিগ্রি সেলসিয়াস ও ডিগ্রি ফারেনহাইট এককে প্রকাশ করা হয়।

গড় উষ্ণতা: কোনও স্থানের প্রতি ঘণ্টার উষ্ণতার যোগফলকে ২৪ দিয়ে ভাগ করলে গড় উষ্ণতা পাওয়া যায়। এটি তিন প্রকার।

ক) দৈনিক গড় উষ্ণতা: দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতাকে যোগ করে যোগফলকে ২ দিয়ে ভাগ করলে যে উষ্ণতা হয় তাকে দৈনিক গড় উষ্ণতা বলে।

খ) মাসিক গড় উষ্ণতা: কোনও মাসের প্রতিদিনের গড় দৈনিক উষ্ণতাকে যোগ করে সেই মাসের মোট দিন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে উত্তর আসে তাই মাসিক গড় উষ্ণতা।

গ) বার্ষিক গড় উষ্ণতা: ১২ মাসের গড় মাসিক উষ্ণতাকে যোগ করে যোগফলকে ১২ দিয়ে ভাগ করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাকে বার্ষিক গড় উষ্ণতা বলে।

উষ্ণতার প্রসর: কোনও নির্দিষ্ট স্থানের বছরের উষ্ণতম ও শীতলতম মাসের গড় উষ্ণতার বিয়োগফল বা দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতার বিয়োগফলকে উষ্ণতার প্রসর বলে। এটি দুই প্রকার হয়—

ক) দৈনিক উষ্ণতার প্রসর: কোনও স্থানের একটি দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার বিয়োগফলকে দৈনিক উষ্ণতার প্রসর বলে।

খ) বার্ষিক উষ্ণতার প্রসর: কোনও স্থানের বছরের সর্বোচ্চ গড় মাসিক উষ্ণতা থেকে সর্বনিম্ন গড় মাসিক উষ্ণতাকে বিয়োগ করলে বিয়োগফল হল গড় বার্ষিক উষ্ণতা।

বায়ুমণ্ডলের তাপের তারতম্যের কারণ: যার উপরে বায়ুমণ্ডলের তাপ নির্ভর করে সেগুলি হল—

ক) অক্ষাংশ: নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়ে, তাই এখানে গরম বেশি বলে উষ্ণমণ্ডল তৈরি হয়েছে। মধ্য অক্ষাংশে তীর্যকভাবে পড়ে বলে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল আর দুই মেরু অঞ্চলে সূর্যরশ্মি খুব সামান্য পড়ে বলে এখানে হিমমণ্ডল তৈরি হয়েছে।

খ) উচ্চতা: উচ্চতার উপর বায়ুমণ্ডলের তাপ নির্ভর করে। ট্রপোস্ফিয়ারে প্রতি কিলোমিটার উচ্চতায় ৬.৪° করে উষ্ণতা কমে। সেই কারণে পাশাপাশি অবস্থিত দার্জিলিং আর শিলিগুড়ির মধ্যে শিলিগুড়িতে গরম বেশি।

গ) বৈপরীত্য উত্তাপ: উচ্চতা অনুযায়ী তাপের হ্রাসকে স্বাভাবিক উষ্ণতা হ্রাসের হার বলে। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে রাতের বেলা পার্বত্য ঠান্ডা বায়ু নীচে নেমে আসে আর উপত্যকার গরম বায়ু উপরে উঠে যায়। ফলে উপত্যকায় ঠান্ডা ও পাহাড়ের উপরিভাগে গরম বায়ু থাকে, একে উষ্ণতার বৈপরীত্য বা বৈপরীত্য উত্তাপ বলে। সেক্ষেত্রে শীতল নিম্নমুখী বায়ুকে ক্যাটাবেটিক বায়ু আর ঊর্ধমুখী উষ্ণবায়ুকে অ্যানাবেটিক বায়ু বলে।

ঘ) স্থলভাগ ও জলভাগের বণ্টন: কোনও স্থান সমুদ্রের কত কাছে বা দূরে তার উপরও উষ্ণতা নির্ভর করে। তাই সমুদ্রবায়ুর অভাবে মধ্যভারতের উষ্ণতা বেশি আর উপকূলের উষ্ণতা প্রায় সারা বছর সমান।

ঙ) বায়ুপ্রবাহ: কোথায় কীরকম বায়ুপ্রবাহ হচ্ছে তার উপরেও উষ্ণতা নির্ভর করে। যেমন লু বায়ুপ্রবাহের ফলে ভারতে গরমে উষ্ণতা বাড়ে। সেরমই শীতকালে দক্ষিণ তিব্বতে তুষারপাত হয়।

চ) সমুদ্রস্রোত: সমুদ্রস্রোতের ফলে উপকূলবর্তী অঞ্চলের উষ্ণতার তারতম্য দেখা যায়। তাই শীতল ক্যানারি স্রোতের প্রভাবে ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল।

ছ) ভূমির ঢাল: পর্বতের যে-দিকটা নিরক্ষরেখার দিকে অবস্থান করে সে-দিকের উষ্ণতা তার বিপরীতদিকের অপেক্ষা বেশি হয়।

জ) মেঘাচ্ছন্নতা: যেখানে মেঘ বেশি সেখানে গরম বেশি হয় আর যেখানে বৃষ্টি বেশি সেখানে তুলনামূলক ঠান্ডা হয়। সেই জন্য মৌসিনরামে বেশি ঠান্ডা।

ঝ) স্বাভাবিক উদ্ভিদ: যেখানে স্বাভাবিক উদ্ভিদ বেশি সেখানে বৃষ্টি বেশি হওয়ায় উষ্ণতা কম থাকে।

ঞ) ভূমিরূপ: ভূমিরূপ অনুযায়ী উষ্ণতার তারতম্য ঘটে। তাই সমভূমির উষ্ণতা সমভাবাপন্ন আর পাহাড়ে ঠান্ডা পড়ে।

ট) পর্বতের অবস্থান: পর্বতের অবস্থানের কারণে সাইবেরীয় বায়ু ভারতে প্রবেশ করতে পারে না, ফলে ভারতের তাপমাত্রার খুব তারতম্য হয় না।

ঠ) মৃত্তিকা: কাঁকড়ময় ভারতীয় মৃত্তিকায় গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা বেশি থাকে। পলিমাটিতে তুলনামূলক কম।

ড) নগরায়ন: নগরায়নের ফলে প্রকৃতির সার্বিক ক্ষতি হচ্ছে, ফলে উষ্ণতা বাড়ছে।

ক্লাস টেন-এর টিউশন | ইংরেজি

The Snail
(দ্য স্নেইল) শামুকটি

আজকে একটা শামুকের জীবনকে আমরা তার চোখ দিয়ে দেখব। উইলিয়াম কুপার (১৭৩১-১৮০০) কবিতায় শামুকের ব্যক্তিগত, নির্জন পরিসরকে তুলে ধরেছেন। সেখানে সে নিজেই নিজের রাজা। কবি প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা লেখায় জনপ্রিয় হয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রকৃতি নিয়ে লেখা কবিতার তিনি মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কবিতায় গ্রামের মানুষের জীবনের খুঁটিনাটি ফুটে উঠত।

আজকের পাঠ্য কবিতাতেও তিনি শামুকের মতো একটি প্রাণী, যাকে আমরা ঠিকমতো নজরই করি না তার জীবনকে তুলে ধরেছেন। শামুক ঘাস, পাতা, ফল বা দেওয়ালে এমনভাবে আটকে থাকে যে তার পড়ার কোনও ভয় থাকে না। সে এমনভাবে থাকে যেন তার জন্ম সেখানেই। সেখানেই ভয়ে সে মুখ লোকায়, যখনই কোনও বিপদ আসে বা খারাপ আবহাওয়ায় ভয়ের আশঙ্কা থাকে। তার শুঁড়ে সামান্য একটু ছোঁয়া দিলেই সে বিরক্তিতে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। সেখানে শুধুই তার ধন-সম্পত্তি, সে একাই নিজের সব ভোগ করে।

শব্দার্থ: sticks-লেগে থাকে, secure- সুরক্ষিত, imminent-আসন্ন, horns-শুঁড়, shrinks-গুটিয়ে যায়, displeasure-অসম্মতি, dwells- বাস করে, except-ব্যতিরেকে, ছাড়া, chattels-ব্যক্তিগত মালপত্র, satisfied-সন্তুষ্ট।

1. Fill in the blanks with proper alternative from the bracket.

a. With the slightest touch, the snail shrinks into its house with ___. (displeasure/ pain/ surprise)

Ans: With the slightest touch, the snail shrinks into its house with displeasure .

b. In its house, the snail lives with ____. (parents/ friends/ no one)

Ans: In its house, the snail lives with no one.

c. The snail sticks ____ nor fears to fall. (far/ beside/ close)

Ans: The snail sticks close nor fears to fall.

2. Write whether the following statements are T (true) or F(False).

a. The snail fears to fall from the wall. F

b. The snail comes out of his house during a storm.F

c. The snail and his house are inseparable. T

d. The shell is snail's house. T

e. The snail is unhappy to live alone. F

3. Answer the following questions.

a. What does the snail usually stick itself to?

Ans: The snail usually sticks itself to grass, leaf and to its wall of its own house.

b. What makes the snail well satisfied?

Ans: The snail dwells in his own house with all his belongings and whole treasure. This makes him well-satisfied.

c. When does the snail hide faster?

Ans: The snail hides faster in the danger.

d. Whom does the snail live with?

Ans: The snail lives alone without his belonging in his house.

e. Why is there no cause of fear to fall on the ground?

Ans: The snail has no fear to fall down because it sticks to place where it rests.

4. Put the numbers respectively.

a. The snail hides secure in his house.

b. He shrinks into his house.

c. The snail sticks close.

d. The snail is touched slightly.

e. He dwells alone in his house.

Ans. 1. c, 2. a, 3. d, 4. b, 5. e.

5. Change the following sentences into questions.

a. Siraj always rises early. (interrogative sentence using when')

Ans: When does Siraj rise?

b. Shyam is the best student in the class. (interrogative sentence using who')

Ans: Who is the best student in the class?

c. I like to play football. (interrogative sentence using what')

Ans: What do you like to play?

6. Write opposite words of the following.

Shrink - Open, Slight - Much, Incoming - Outgoing, Stick - Fall, Together - Alone, Secure - Unsafe, Harm - Benefit, Whole - Some.

কি-বোর্ড প্র্যাকটিস (বাংলা টাইপ)

চতুর্থ পাঠ (শিফট-কি ব্যবহার)

তৃতীয় পাঠের মতো একই নিয়মে কি-গুলোকে পরিচালনা করতে হবে তবে Shift-কি ব্যবহার করে অর্থাৎ কি-বোর্ডের শিফট-কি চেপে ধরে প্রতিটি অক্ষর টাইপ করতে হবে এবং প্রতিটি অক্ষরের মাঝে তিনটি করে স্পেস দিতে হবে। প্রথমে ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে Shift-কি চেপে ধরে বাম হাতের অংশ এবং তারপর বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে Shift-কি চেপে ধরে ডান হাতের অংশ এক এক করে টাইপ করতে হবে। নীচের অনুশীলনটি কমপক্ষে ১০০বার টাইপ করতে হবে।

বামহাতের অংশ: ং য় ঢ ফ ঠ

ডানহাতের অংশ: ঢ় ঘ ঞ ঝ ছ

এন্টার-কি চেপে নীচের লাইনে যেতে হবে। এভাবে কমপক্ষে ১০০বার অনুশীলনটি টাইপ করতে হবে।

এরপর প্রতিটি শব্দের পর একটি করে স্পেস দিয়ে নীচের অনুশীলনটি কমপক্ষে ১০বার টাইপ করতে হবে।

ছবি; ফাটা; কাছাকাছি; মিঞা; ঘড়ি; ঢংঢং; ঝাড়বাতি; ফড়িং;

পঞ্চম পাঠ

এরপর নীচের লাইন থেকে শুরু করতে হবে। অর্থাৎ কি-বোর্ডের যে লাইনে (ZXCVB) লেখা আছে। আগের মত একই নিয়মে কীগুলোকে পরিচালনা করতে হবে। প্রথমে বাম হাতের অংশ এবং তারপর ডান হাতের অংশ এক এক করে টাইপ করতে হবে। নিচের অনুশীলনটি কমপক্ষে ১০০বার টাইপ করতে হবে।

বামহাতের অংশ: ্ ও ে র ন

ডানহাতের অংশ: / . , ম স

এন্টার-কি চেপে নীচের লাইনে যেতে হবে এভাবে কমপক্ষে ১০০ বার অনুশীলনটি টাইপ করতে হবে।

এরপর প্রতিটি শব্দের পর একটি করে স্পেস দিয়ে নীচের অনুশীলনটি কমপক্ষে ১০বার টাইপ করতে হবে।

মসৃন; ওঝা; পঠন; রঙবেরঙ; সমতা; সাতরং;

ষষ্ঠ পাঠ (শিফট-কি ব্যবহার)

পঞ্চম পাঠের মতো একই নিয়মে কীগুলোকে পরিচালনা করতে হবে তবে Shift-কি ব্যবহার করে প্রতিটি অক্ষর টাইপ করতে হবে এবং প্রতিটি অক্ষরের মাঝে তিনটি করে স্পেস দিতে হবে। প্রথমে ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে Shift-কি চেপে ধরে বাম হাতের অংশ এবং তারপর বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে Shift-কি চেপে ধরে ডান হাতের অংশ এক এক করে টাইপ করতে হবে। নীচের অনুশীলনটি কমপক্ষে ১০০বার টাইপ করতে হবে।

বামহাতের অংশ: ১ । ৈ ল ণ

ডানহাতের অংশ: ? > < শ ষ

এন্টার-কি চেপে নীচের লাইনে যেতে হবে এভাবে কমপক্ষে ১০০বার অনুশীলনটি টাইপ করতে হবে।

এরপর প্রতিটি শব্দের পর একটি করে স্পেস দিয়ে নিচের অনুশীলনটি কমপক্ষে ১০বার টাইপ করতে হবে।

সত্য; মিথ্যা; ওষুধ; বৈঠক; বৌ; শীঘ্র।

উপরের অনুশীলনটি শেষ হলে প্রতিটি শব্দের পর একটি করে স্পেস দিয়ে নীচের অনুশীলনটি কমপক্ষে ৫০বার টাইপ করতে হবে।

আমার দেশের নাম ভারত। দিল্লি ভারতের রাজধানী। ঘরের খবর পরের কাছে। তুমি কেমন করে বাড়ি যাবে? যদি তোমার বাড়ির পাশে আমার বাড়ি হতো, তাহলে বেশ হতো।

যুক্ত অক্ষর তৈরির নিয়ম:

ইংরেজি টাইপ এবং বাংলা টাইপের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল যুক্ত অক্ষর তৈরি করা। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে উপরের পাঠগুলির কোনওটিতেই যুক্ত অক্ষর নেই। যুক্ত অক্ষর তৈরি করার জন্য কি-বোর্ডের অন্য একটি অক্ষরের সহায্য নিতে হয়। আর সেই অক্ষরটি হল ইংরেজি 'জি'(G)। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক আমাদের স্ক' যুক্ত অক্ষরটি টাইপ করতে হবে। তবে এক্ষত্রে উচ্চারণটা খুবই জরুরি। কারণ যে দুটো অক্ষর যুক্ত করতে হবে তা সঠিক উচ্চারণের উপর ভিত্তি করে কম্পিউটারকে বোঝাতে হবে ঠিক কোন কোন অক্ষর যুক্ত করতে চাই। আর যুক্ত করার বিষয়টি কম্পিউটারকে বোঝাতে হবে G এই অক্ষরটি দিয়ে। 'স্ক' বানান টাইপ করতে হলে প্রথমে 'স' অক্ষরটি যেখানে আছে সেই কি চাপতে হবে তারপর ওই G কী চেপে 'ক' অক্ষরটি যেখানে আছে সেই কি চাপতে হবে। অর্থাৎ স+G+ক = স্ক। এভাবেই বাংলা টাইপের যাবতীয় যুক্ত অক্ষরগুলি তৈরি করতে হবে। এছাড়া স্বরবর্ণের কিছু অক্ষর এখানে নেই যেমন- এ, ঐ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঔ, ঋ ইত্যাদি।

এ অক্ষরগুলো লিখতে প্রথমে ইংরেজি G অক্ষরটি চেপে যে বর্ণটি লিখতে চাই তার চিহ্নটি চাপতে হবে। যেমন—এ = G+ে (জি যোগ এ'কার), ঐ= G+ ৈ(জি যোগ ওই'কার), ই= G+ ি(জি যোগ ি'কার), ঈ= G+ী (জি যোগী'কার), উ= G+ু (জি যোগু'কার), ঊ= G+ূ (জি যোগূ'কার), ঔ= G+। (জি যোগ ।'কার), ঋ= G+ৃ(জি যোগৃ'কার) ইত্যাদি।

ক্যালেন্ডার আবিষ্কার

প্রথম পাতার পর

তাঁরই নাম অনুসারে ক্যালেন্ডারটির নামকরণ করা হয় গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার। এবং সেই ক্যালেন্ডার অনুযায়ীই জানুয়ারির ১ তারিখকে বছরের প্রথম দিন গণ্য করা হয়। গ্রেট ব্রিটেনে এই গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার প্রচলিত হয় ১৫৬ খ্রিস্টাব্দে। আর আমাদের দেশে এই ক্যালেন্ডার নিয়ে আসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। যেহেতু প্রাচীন রোমানদের হাতেই এই ক্যালেন্ডারের সৃষ্টি, তাই ইংরেজি বছরের ১২ মাসের বেশির ভাগের নামই রোমান দেবতা বা সম্রাটের নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে।

জানুয়ারি: রোমান দেবতা জানোক্স-এর নামানুসারে।

ফেব্রুয়ারি: ল্যাটিন শব্দ ফেব্রুয়া থেকে নেওয়া হয়েছে। যার অর্থ পবিত্র।

মার্চ: রোমানদের যুদ্ধ দেবতা মার্সের নামানুসারে।

এপ্রিল: ল্যাটিন শব্দ এপিলিস নামানুসারে, যার অর্থ খোলা।

মে: বসন্তের দেবী মায়াস-এর নামানুসারে।

জুন: বিবাহ এবং নারী কল্যাণের দেবী জুনোর নামানুসারে।

জুলাই: রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের নামানুসারে।

আগস্ট: জুলিয়াস সিজারের পুত্র অগাস্টাস সিজারের নামানুসারে।

সেপ্টেম্বর: ল্যাটিন সপ্তম সংখ্যা সেপ্টেম এর নামানুসারে।

অক্টোবর: ল্যাটিন অষ্টম সংখ্যা অক্টো-র নামানুসারে।

নভেম্বর: ল্যাটিন নবম সংখ্যা নভেম-এর নামানুসারে।

ডিসেম্বর: ল্যাটিন দশম সংখ্যা ডিসেম-এর নামানুসারে।

অন্যদিকে, বাংলা সনের প্রবর্তন করেন বিশ্ববিখ্যাত চেঙ্গিস খান-এর বংশধর মোগল সম্রাট আকবর। সুদূর দিল্লিতে

রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থেকেই তিনি এই দেশে বাংলা সন প্রবর্তন করেন। 'সন' ও 'তারিখ' দুটিই আরবি শব্দ। বাংলা সনের সূত্রপাত হয় আরবি হিজরি সনের উপর ভিত্তি করে। আকবরের নির্দেশে ৯৯৮ হিজরি হিসাবে ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সনের প্রবর্তন হয়। বাদশাহ আকবর ৯৬৩ হিজরিতে অর্থাৎ ১৫৫৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি দিল্লির সিংহাসনে আহরণ করেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনা চিরস্মরণীয় করে রাখতে ৯৬৩ হিজরি অবলম্বন করেই বাংলা সন চালু হয়। অর্থাৎ ১, ২, ৩ এভাবে হিসাব করে নয়, মূল হিজরি সনের চলতি বছর থেকেই বাংলা সনের গণনা শুরু হয়। ফলে জন্ম বছরেই বাংলা সন ৯৬৩ বছর বয়স নিয়ে যাত্রা শুরু করে। একই ভাবে, হিজরি সনের প্রথম দিন হল হেলা মহরম। বাংলা সনে তা পরিবর্তন করে পহেলা বৈশাখ করা হয়। বাংলা সনের সৃষ্টি হয় ফসল তোলার সময় দেখে। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে সৌর বছর অবলম্বনে এই নতুন সন গণনা শুরু হয়। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে এটি 'ফসলি সন' নামে অবিহিত হয়। পরে 'বাংলা'র জন্য উদ্ভাবিত হওয়ায় এর নাম 'বাংলা সন' পড়ে।

'ফসলি সন' যখন প্রবর্তিত ছিল তখন ১২ মাসের নাম ছিল যথাক্রমে কারওয়াদিন, আরদিভিহিসু, খারদাদ, তীর, আমরাদাদ, শাহরিয়ার, মিহির, আবান, আয়ুর, দায়, বাহমান এবং ইসকান্দার মিয। যা পরবর্তী পর্যায়ে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়। এই নামগুলিও কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। যেমন--

বৈশাখ- বিশাখা, জ্যৈষ্ঠ- জ্যেষ্ঠ, শ্রাবণ- শ্রাবণা, ভাদ্র- ভাদ্রপদা, আশ্বিন- আশ্বিনী, কার্তিক- কার্তিকা, অগ্রহায়ণ- আগ্রহায়ণ, পৌষ- পৌষা, মাঘ- মঘা, ফাল্গুন- ফাল্গুনী এবং চৈত্র- চিত্রা।

সন হিসাবে 'বাংলা সন' নিঃসন্দেহে খুবই কার্যকর ও বিজ্ঞানসম্মতও বটে। কারণ, এটি একই সঙ্গে চন্দ্র ও সৌর পদ্ধতির সার্থক উত্তরাধিকারী। এর প্রথমাংশ অর্থাৎ ৯৬৩ বছর সম্পূর্ণভাবে হিজরি সন ভিত্তিক তথা চন্দ্র সন। পরবর্তী অংশ অর্থাৎ ৯৬৩ থেকে এখন পর্যন্ত সৌরভিত্তিক। ফলে বিশ্বে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত ইংরেজি তথা গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের সঙ্গে বাংলা সন সামঞ্জস্য রেখে চলে। বিজ্ঞানসম্মত তথা হিজরিভিত্তিক এই বাংলা সন নিঃসন্দেহে আমাদের গৌরব।

বৃষ্টি ঘোষ

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ৩ জানুয়ারি ২০১৭

স্মরণীয় যাঁরা

(৩ জানুয়ারি - ৯ জানুয়ারি)

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বীর বিপ্লবী

রামকৃষ্ণ রায়

(জন্ম: ৯ জানুয়ারি ১৯১২, মৃত্যু: ২৫ অক্টোবর ১৯৩৪)

জন্ম তাঁর মেদিনীপুরে। পিতার নাম কেনারাম রায়। কৈশোরেই বিপ্লবী দলের সদস্য হন। ১৯৩৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর অত্যাচারী ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ সাহেব মেদিনীপুর কলেজ মাঠে ফুটবল খেলতে নামেন। খেলা প্র্যাকটিসের ছল করে বল নিয়ে মাঠে নামেন কয়েকজন বিপ্লবী। মাঠেই তাঁরা বার্জ সাহেবকে আক্রমণ করলে তিনি মারা যান। পুলিশ প্রহরীদের পাল্টা গুলিতে অনাথবন্ধু পাঁজা ও মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত নিহত হন এবং অপর বিপ্লবীরা পালিয়ে যান। পরে ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়, নির্মলজীবন ঘোষ, নন্দদুলাল সিং, কামাখ্যা ঘোষ, সুকুমার সেন, সনাতন রায়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মামলা হয়। বিচারে ব্রজকিশোর, রামকৃষ্ণ ও নির্মলজীবনের ফাঁসি হয় মেদিনীপুর জেলে। নন্দদুলাল সিং, কামাখ্যা ঘোষ, সুকুমার সেন এবং সনাতন রায়-এর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়।

উত্তরণ

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ৩ জানুয়ারি ২০১৭

উত্তরণ-এর ১৭, ২৪ ও ৩১ জানুয়ারি

মাধ্যমিক স্পেশাল সংখ্যা

TEAM উত্তরণ

শর্মিলা চন্দ্র
(কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর)
তনুশ্রী দাস | সালমা আহমেদ
বিদিশা রায়চৌধুরী (গুয়াহাটি)
এনায়তি দেবদত্ত (শিলচর)

আগামিকাল বিনামূল্যে
৮ পাতার ক্রোড়পত্র
যুগশঙ্খ SUPPLI

ছাত্রছাত্রীদের মূল্যবোধ সৃষ্টিতে শিক্ষকের ভূমিকা

সমাজ তথা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা– এই তিনটির মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। আজকের ছাত্র আগামিদিনে জাতির কর্ণধার। শিক্ষক মূল্যবোধ বিনির্মাণের আদর্শ কারিগর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মূল্যবোধ চর্চার অনন্য কারখানা। শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। শিক্ষা ভালো-মন্দ বিচার করতে শেখায় ও এই বিচার মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। এবং একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে সমাজকে আলোকিত ও উদ্ভাসিত করতে পারেন।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে মূল্যবোধ আসলে কী? দৈনন্দিন সমাজ জীবনে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচরণ যে নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকেই সামাজিক মূল্যবোধ আখ্যা দেওয়া যায়। ধর্ম, বিশ্বাস, নীতি-নৈতিকতা, জীবন দর্শন, রাজনৈতিক আদর্শ, যা আমাদের সমাজ-সংস্কৃতিকে লালন করে থাকে সে-সবই আমাদের মূল্যবোধের অন্তর্গত। এবং একমাত্র শিক্ষাই সমাজে মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারে। কেননা, শিক্ষা ছাড়া আচার-আচরণে বিনয়ী ও নম্র হওয়া যায় না। শিক্ষা বিনয়ী-নম্র-ভদ্র হতে শেখায়। তাই সমাজে যে সমস্ত শিক্ষক, শিক্ষা ও মূল্যবোধ বিকাশে ভূমিকা রাখবেন তাঁদেরও সেই মানের হতে হবে। একমাত্র একজন আদর্শ শিক্ষকই পারেন শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে সমাজে নৈতিকতার বিকাশ ঘটাতে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মানসিক ও শারীরিক দুঃখ, ব্যথা, প্রয়োজন ও অসহায় অবস্থার কথা আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করবেন এবং এগুলোর উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী হবেন-- এটাই স্বাভাবিক। শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের থাকা চাই ভালোবাসা ও সহানুভূতি। সব শিক্ষার্থীকে তিনি ভালোবাসবেন। তাঁর ভালোবাসার স্পর্শ থেকে কোনও শিক্ষার্থী বঞ্চিত হবে না। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে পাপ থেকে পরিত্রাণ করে জাগতিক কল্যাণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন। চিনের প্রাচীন ও সামাজিক তথা ধর্মীয় নেতা কনফুসিয়াস বলেছেন, 'শিক্ষক হবেন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উৎস। তিনি হবেন একজন আদর্শ শাসক।' শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীর বন্ধু, সহায়ক ও যোগ্য পরিচালক। শিক্ষার মাধ্যমে তিনি শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করবেন। যুগে যুগে পরিবার ও সমাজে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে শিক্ষক-সমাজই প্রধান ভূমিকা পালন করে এসেছেন। শিক্ষক ও মূল্যবোধ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষক মূল্যবোধের মূর্ত প্রতীক। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর শিক্ষক হলেন জাতির দিক নির্দেশক, মূল্যবোধ বিকাশের প্রধান সেনাপতি। শিক্ষক হলেন মূল্যবোধ সৃষ্টির নিপুণ শিল্পী।

শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। শিক্ষকতা হল ব্রত, সাধনা। এই পেশার সাফল্য ও স্বার্থকতা নির্ভর করে শিক্ষকের নৈতিক গুণাবলী এবং দক্ষতা, যোগ্যতা, বিচার কৌশল ও ব্যক্তিত্বের উপর। শিক্ষক হলেন মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। তাঁকে কেন্দ্র করেই পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। শিক্ষার্থীর মধ্যে মূল্যবোধের পসার তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। শিক্ষককে বাদ দিয়ে সমাজে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাঁকে বাদ দিয়ে কোনও নৈতিক শিক্ষাও পরিপূর্ণ হতে পারে না। তিনিই নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পাঠ পড়ান। একমাত্র আদর্শ শিক্ষকই পারেন এই কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে।

আমাদের দেশে দিন দিন অসংখ্য স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠছে। এসব প্রতিষ্ঠানে পাঠদান করছেন হাজার হাজার শিক্ষক। কিন্তু এ সত্ত্বেও মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে। বিভিন্ন কারণেই শিক্ষকসমাজ প্রত্যাশিত শিক্ষা ও সামাজিক মূল্যবোধ তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারছেন না। শিক্ষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ছাড়া শিক্ষক-সমাজ এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে না বলেই সচেতন মহলের মতামত। শিক্ষকদের পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার অভাব, বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা ও বেতন কাঠামো, শিক্ষা ব্যবস্থাকে দলীয়করণ, দক্ষ শিক্ষকের অভাব এবং শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদার অভাবের কারণে শিক্ষক-সমাজ সমাজের মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারছেন না। সমাজ ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টি করার জন্য শিক্ষক-সমাজের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির কোনও বিকল্প নেই। সমাজে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষা বৈষম্য দূর করতে হবে। পাশাপাশি মেধাবী, যোগ্য ও সৎ ব্যক্তিদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করতে হবে। এছাড়া, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখতে হবে। যাঁরা শিক্ষকতায় আসবেন তাঁদের শিক্ষকতাকে পেশার চেয়ে ব্রত হিসাবে বেশি গ্রহণ করতে হবে। কেন না, শিক্ষক ও শিক্ষক সমাজের মধ্যে যদি মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দেয়, তাহলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বর্তমান সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুণধরা মূল্যবোধকে শিক্ষক-সমাজই আবার জাগিয়ে তুলতে পারেন। ছাত্রছাত্রী, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার প্রধান কর্ণধারের ভূমিকা পালন করতে হবে শিক্ষকদেরই।

উত্তরণ টিপস

পড়া মনে রাখার দশটি সহজ কৌশল

'পড়া মনে থাকে না' কিংবা 'যা পড়ি সব ভুলে যাই'– এই অভিযোগটা প্রায় প্রত্যেক পড়ুয়ার। তবে এই নিয়ে হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই। কয়েকটি নিয়ম মেনে চললেই এই সমস্যা থেকে খানিকটা মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

এক | পড়তে বসার আগে দশ মিনিট হাঁটা: পড়ার টেবিলে বসার আগে মিনিট দশেক হাঁটলে বা হালকা ব্যায়াম করলে মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা বাড়ে। এতে পড়া মনে রাখতে বেশ সুবিধে হয়। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় দেখা গেছে, পড়ার আগে দশ মিনিট হাঁটলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা প্রায় দশ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়। তাই একটু হাঁটার পর পড়া শুরু কর।

দুই | পড়ার পতি আকর্ষণ অনুভব করা: যে-বিষয়টি পড়বে তার প্রতি আকর্ষণ জাগাতে হবে। কিংবা আকর্ষণীয় ভাবে পড়ার চেষ্টা কর। এতে সহজে পড়া মনে থাকবে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মতে, মানুষ কোনও কিছুর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলে তা সহজেই মস্তিষ্কে মেমরি বা স্মৃতিতে রূপান্তর হয় এবং তা দীর্ঘস্থায়ীও হয়।

তিন | কালারিং বা মার্কার পেন ব্যবহার করে দাগিয়ে পড়া: আমাদের মধ্যে অনেকেই মার্ক করে বা দাগিয়ে পড়ে। এটাও পড়া মনে রাখতে বেশ কার্যকর। মার্ক করার ফলে শব্দ বা বাক্যের প্রতি আকর্ষণ ও আগ্রহ বাড়ে। পাশাপাশি এর উপর ব্রেইনের ভিজ্যুয়ালিটি এফেক্টও বেড়ে যায়, যা পড়া মনে রাখতে সাহায্য করে।

চার | বেশি বেশি পড়া ও প্র্যাকটিস করা: আমাদের মস্তিষ্ক ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিগুলোকে তখনই দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে পরিণত করে যখন তা বারবার ইনপুট করা হয়। বারবার ইনপুট হলে ব্রেইনের স্মৃতি গঠনের স্থানে গাঠনিক পরিবর্তন হয় এবং তা দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি তৈরিতে সাহায্য করে। তাই বেশি করে পড়া ও প্র্যাকটিস করা পড়া মনে রাখার অন্যতম উপায়।

পাঁচ | লিখে লিখে বা ছবি এঁকে পড়ার অভ্যাস করা: কোনও জিনিস পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখলে বা ছবি আঁকলে পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়ে। কারণ, নিউরোসায়েন্সের মতে, কিছু লিখলে বা ছবি আঁকলে মস্তিষ্কের অধিকাংশ জায়গা উদ্দীপিত হয় এবং ছবি বা লেখাটিকে স্থায়ী মেমরিকে রূপান্তরিত করে ফেলে। ফলে পড়াটি মস্তিষ্কে দীর্ঘস্থায়ী হয়। সাধারণভাবেও বোঝা যায়, বইতে সে-সমস্ত বিষয় ছবি দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়, সেগুলি আমাদের বেশি মনে থাকে। পরীক্ষার সময়ও চোখের সামনে বইয়ের ছবি ভেসে ওঠে। তাই লিখে বা ছবি এঁকে পড়া অনেক কার্যকর।

ছয় | কনসেপ্ট ট্রি ব্যবহার করে পড়া: কোনও বিষয় পড়ার আগে অধ্যায়গুলোকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে নিলে পড়তে সুবিধে হয়। একে একটি গাছের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। গাছটিকে একটি অধ্যায় মনে করে প্রতিটি পাতায় অংশগুলোর একটি করে সারমর্ম লিখে পড়লে পড়া মনে রাখতে সহজ হয়। এই পদ্ধতিকে কনসেপ্ট ট্রি বলা হয়। পড়া মনে রাখতে এটি বেশ কার্যকর।

সাত | পড়ার জন্য সঠিক সময় নির্বাচন করা: অনেকের ধারণা থাকে, দিন-রাত পড়লেই পড়া বেশি মনে থাকে। এটা একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা। কারণ, সবসময় আমাদের মগজ একইভাবে কাজ করতে পারে না। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, বিকালের পর আমাদের মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়তে থাকে। তাই বিকালের পর অর্থাৎ সন্ধ্যায় বা রাতে পড়া বেশি কার্যকর হয়।

আট | নিমনিক তৈরি করা: আমাদের মগজ অগোছালো জিনিস মনে রাখতে পারে না। তাই কোনও কিছু ছক বা টেবিল আকারে সাজিয়ে নিলে কিংবা কবিতার ছন্দ বানিয়ে পড়লে তা সহজেই মনে রাখা যায়। পড়া মনে রাখার এই কৌশলকে নিমনিক বলা হয়।

নয় | পর্যাপ্ত ঘুম: গবেষণায় দেখা গেছে, আমাদের মগজ যে-কোনও তথ্যকে মেমরি বা স্মৃতিতে পরিণত করে ঘুমানোর পর। তাই পড়া মনে রাখতে হলে পর্যাপ্ত ঘুমেরও প্রয়োজন রয়েছে। সাধারণত একজন সুস্থ মানুষের দিনে আট ঘণ্টা ঘুমনো উচিত। তাই পড়া মনে রাখার জন্য ঘুমের ক্ষতি হলে সেই পড়া বেশিক্ষণ মনে থাকে না।

দশ | যা পড়েছ তা অন্যকে শেখানো: পড়া মনে রাখার জন্য প্রাচীনকাল থেকেই এই পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়। নিজে যা পড়েছি বা জেনেছি, তা অন্যকে শেখানোর মাধ্যমে মস্তিষ্কে আরও ভালো ভাবে গেঁথে যায়। তাছাড়া, অন্যকে শেখানোর ফলে নিজের দক্ষতা প্রকাশ পায় এবং পড়াটি ভালো ভাবে আয়ত্ত হয়েছে কি না, তাও বোঝা যায়।